আমার বাল্যবন্ধু

শ্রীঅমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

আন্তরিকতার সঙ্গে—

ঃ আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের ঃ

জানু ভানু কৃশানু
রক্তাক্ত খাইবার
হায়নার হাসি

প্রকাশের অপেক্ষায়

মরণ দোলায় দোলা

এক

'বিরাজমোহন দৃষ্টি ফেরালেন।

জোড়া বালিসে ঠেসান দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় বসে আছেন তিনি। বয়স পঁয়শট্টি বছরের কম হবে না। মাজা মাজা গায়ের রং। ঈষৎ রক্তাভ চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। খাড়া নাক মুখের উপর দাম্ভিকতার ছায়া ফেলেছে। পরিচিত মহলে তিনি কঠোরভাষী ও বদরাগী হিসাবেই চিহ্নিত।

এতক্ষণ পরে নিজের থলথলে শরীরকে একরকম নাচিয়ে বিরাজমোহন হাই তুললেন। দীর্ঘস্থায়ী হাই শেষ হবার পরই তাঁর ভ্রূ কুঁচকে এল। কুটিলতার ছাপ মুখের রেখায় রেখায় ফুটে উঠল। তিনি তাঁর দৃষ্টি ঘরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সঞ্চালিত করলেন।

বিরাজমোহন অবশ্য ঘরে একা নেই।

নানা বয়সের জনাকয়েক নারীপুরুষ কিছুটা সঙ্কুচিত ভাবে বসে আছেন, খাটের কাছাকাছি ডিভান ও কোচগুলিতে। এঁরা প্রত্যেকেই বিরাজমোহনের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সম্পর্কিত। এঁদের উপস্থিতিই যে ওঁকে বিরক্ত করে তুলেছে তা বলতে অপেক্ষা রাখেনা।

খাটের পাশেই ছোট একটা টেবিল।

টেবিলের উপর প্রয়োজনীয় অনেক কিছু রাখা।

ডান হাত দিয়ে ওখান থেকে কিছু নিতে গিয়েও উনি থামলেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, কালীনাথ—

একমাত্র কালীনাথই দাঁড়িয়েছিল।

দাঁড়িয়েছিল সে কর্তার খাটের কাছাকাছিই। বয়স চল্লিশের সামান্য উপরে। দেখে চালাক চতুরই মনে হয়। হাড়বারকরা শরীরকে এখন ঘিরে রয়েছে ধুতি আর হাফ হাতা সার্ট।

কর্তার ডাকের উত্তরে তাড়াতাড়ি বলল, আজ্ঞে—

—তুমি একটু আগে কি যেন বলতে চাইছিলে?

আমতা আমতা করে কালীনাথ বলল, আজ্ঞে, আমি উকীলবাবুকে খবর দিয়েছি।

—উকীল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বিচিত্র কথা শোনাচ্ছ তুমি। আমি তো কোন উকীলের কথা বলিনি।

—আজ্ঞে···মানে···

প্রায় ফেটে পড়লেন বিরাজমোহন।

—ওল্ডফুল। দিন দিন কচি খোকা হয়ে যাচ্ছ। কাকে কি বলতে হয় সে জ্ঞানটুকু পর্যন্ত এখনও তোমার হল না। এটর্ণীকে কেউ উকীল বলে না। যত সব বাজে লোক নিয়ে আমার কারবার। সারা কলকাতা খুঁজলেও তোমার মত ইডিয়াট দুটো পাওয়া যাবে না।

দম নেবার জন্য থামলেন বোধহয়।

বললেন আবার, তা কি বললেন মি. মিত্র?

কালীনাথ ঘামতে আরম্ভ করেছিল।

বলল কোন রকমে, কাল সকালে আসবেন বলেছেন।

—সকাল কটায়?

—বলেছেন কোর্টে যাবার পথে আসবেন।

আর কোন প্রশ্ন না করে, দামী ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে জার্মান সিলভারের নক্সাকাটা পানের ছোট বাটাটা বার করলেন বিরাজমোহন। খানচারেক পান চালান করে দিলেন মুখে, এক

চিমটি সুরোভিত জর্দ্দাও। চোখ বন্ধ হয়ে এলো। চর্ব্বন সুখ উপভোগ করতে লাগলেন।

কুড়ি বছর আগে বাঁকুড়ার কোন এক গণ্ডগ্রাম থেকে আগত বিরাজমোহন করগুপ্তকে যাঁরা দেখেছিলেন, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই ঘরে অনায়াস ভঙ্গীতে আধশোওয়া অবস্থায় থাকা ওই লোকটিকে দেখে তাঁরা চিনতে পারবেন না।

মনে হবে এ লোক সে লোক নয়। কেউ কি এত তাড়াতাড়ি নিজের দুরবস্থাকে এমন সোনায় মোড়া করে তুলতে পারে? অথচ সেই অবিশ্বাস্য ঘটনারই নায়ক বিরাজমোহন। অতি দ্রুতই উনি প্রতিষ্ঠার চূড়ায় পৌঁছেছেন। বলা বাহুল্য এরই সঙ্গে তাল রেখে চেহারা আর মেজাজেরও পরিবর্তন হয়েছে।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে যা হয় আর কি। তবে এর মধ্যে যে একটা হাইফেন আছে তা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। কর্মক্ষেত্রে সিংহের মত সংগ্রাম করতে করতে পরিশেষে একজন শিল্পপতি হয়ে উঠেছেন, এরকম একটা ধারনা করে নেওয়াটা বাতুলতা হবে। অবশ্য বাইরের একটা খোলস আছে যথা নিয়মে। ওঁর অফিসের মাথায় যে বিরাট সাইনবোর্ড আছে, তাতে সোনালী অক্ষরে লেখা আছে, করগুপ্ত এণ্টারপ্রাইজ: জেনারেল মার্চেণ্ট অ্যাণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার।

আসল কথা হল, বিরাজমোহন অন্ধকার গলিতে হেঁটেই রোজগার-পাতি করেছেন। আয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকলে, গভীর থেকে গভীর অন্ধকারে সেঁধিয়ে যেতে ওঁকে কখনও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতে দেখা যায়নি। অবশ্য এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এত টাকা নিয়ে উনি করবেনটা কি?

বিয়ে-থা করেন নি।

ছোট একটা ভাই পর্যন্ত নেই।

কে ভোগ করবে ওঁর এই বিপুল বিত্ত?

অবশ্য বিরাজমোহনের আত্মীয়স্বজন কিছু আছেন, তবে সম্পূর্ণ

নিজের বলতে যা বোঝায় তেমন কেউ নেই। ইচ্ছে করেই বিয়ে করেননি। ব্যাপারটা তাঁর কাছেই বিরক্তিকর দায়িত্ব বলে মনে হয়েছে। অবশ্য পয়সা ফেললেই যাদের পাওয়া যায় এমন সমস্ত যুবতীদের উপর বয়সকালে দুর্ব্বলতা ছিল।

এখন তাও নেই।

মদ খান না। পানের প্রতি যা একটু আসক্তি। কাজেই দেখা যাচ্ছে ব্যয় করার তাগিদে উনি আয় করেন না। আসল কথাটা হল এও একটা নেশা। ওই নেশার আনন্দে বিভোর হয়ে এখনও আয় করে চলেছেন।

বেশ কিছুক্ষণ চর্ব্বন সুখ উপভোগ করার পর নিজের দৃষ্টি বিরাজমোহন পিছলে দিলেন উপস্থিত সকলের উপর দিয়ে।

—প্রেমকিশোর—

প্রেমকিশোরের বয়স বছর ত্রিশেক। বেশ চনমনে চেহারা। কোন এক নাম করা সওদাগরী অফিসে চাকরী করে। মাইনে শ'ছয়েক টাকা ছাড়িয়ে গেছে। স্বভাবচরিত্র ভাল বলেই সকলে জানে। সম্পর্কে বিরাজমোহনের স্বর্গগত খুড়তুতো দাদার ছেলে।

—আজ্ঞে আমায় কিছু বলছেন?

বিরাজমোহন ঝাজিয়ে উঠলেন, প্রেমকিশোর নামে আর কেউ এঘরে আছে বলেতো আমি জানি না।

প্রেমকিশোর থতমত খেল।

—ইয়ে……মানে….…

—থাক, আর তোতলাতে হবে না। যত সব বাজে ব্যাপার। তুমি আমার এটর্ণীর কাছে কেন গিয়েছিলে বলতো?

—আমি! কই…না…মানে…

—অস্বীকার করার চেষ্টা করোনা। তুমি যে গিয়েছিলে আমি তা ভাল ভাবেই জানি। যে কারণে গিয়েছিলে, সে আগ্রহ তোমার একার নয়, এঘরে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের প্রত্যেকের।

একটু থেমে বিরাজমোহন গলা চড়ালেন।

—তোমরা কান খুলে শুনে রাখো, আমার যা কিছু আছে মরার পর সঙ্গে নিয়ে যাব না। তোমাদের মধ্যেই ভাগাভাগি করে দেবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু তোমরা এতবড় স্বার্থপর, লোভী, নীচমনা—

—মিঃ করগুপ্ত—

গৃহ চিকিৎসক রজত সেন বাধা দিলেন।

—আপনাকে আগেও বলেছি উত্তেজনা পরিহার করতে হবে। ও সমস্ত কথা এখন থাক। আপনি বরং বিশ্রাম নিন।

—এতক্ষণ পরে তুমি একটা হাসির কথা বললে বটে ডাক্তার। বিশ্রাম! বিশ্রাম নিতে নিতে তো হাড়ে ঘাস গজিয়ে গেল। আমায় বলতে দাও। তুমি শুধু দেখ, আমি কেমন ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত কিছু গুছিয়ে বলি।

ডাক্তার মৃদু হাসলেন।

—ঠাণ্ডা মাথায় কথাবার্তা বললে তো আশঙ্কার কিছু ছিল না। আপনি তো একটুতেই রেগে ওঠেন—অসুবিধা তো ওখানেই।

রজত সেন বেশ কয়েক বছর ধরে বিরাজমোহনের স্বাস্থ্যের পাহারাদারী করছেন। কাছেই, এলগিন রোডে তাঁর চেম্বার থাকেনও ওখানেই। ভাল চিকিৎসক হিসাবে ওই পল্লীতে তাঁর নাম ডাক আছে।

ডাক্তারের কথায় কোন মন্তব্য না করে শুধু মাথা নাড়লেন গৃহকর্তা। পানের দলাটা মুখের মধ্যে চারিয়ে নিয়ে এমন একদিকে তাকালেন যেখানে, যেন কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বসে আছেন একজন প্রৌঢ়া মহিলা।

মুখ চোখ আহামরি কিছু নয়। তবে হাড়ে-মাসে শরীর খানা মন্দ নয়। চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়, গোবেচারা বলতে যা বোঝায় তিনি তা নন। সম্পর্কে গৃহকর্তার দূর সম্পর্কের খুড়তুতো বোন। মধ্যমগ্রাম না নবব্যারাকপুর কোথায় যেন থাকেন। পেশায় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা।

বিরাজমোহন বললেন, তুমি কতদিন পরে এবাড়িতে পা দিলে নয়নতারা? বছর পাঁচেক হবে, তাই না?

একগাল হেসে নয়নতারা বললেন, তুমি ঠিক বলতে পারলে না মেজদা। বছর পাঁচেক নয়—তিন বছর আসিনি।

—তা হবে। এতদিন পরে হঠাৎ—

—ওমা, আসবোনা! তোমার শরীর খারাপ—

—শরীর খারাপ!

—তাইতো শুনলাম।

—কথাটা কে গিয়ে কানে দিল। তোমার ঘোড়েল কর্তাটি আমার বাড়ির চারপাশে প্রতিদিন ঘুরপাক খেয়ে যান নাকি?

নয়নতারা কিছু বলতে গিয়েও থামলেন।

সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বিরাজমোহন বলে চললেন, আমার শরীর খারাপের অজুহাত সামনে রেখে তোমরা সকলে একই দিনে দল বেঁধে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছো। ব্যাপারটা রহস্য-জনক। ভেবেছো, বুড়ো মরতে বসেছে, এই হল বাগিয়ে নেবার সময়। অন্য কেউ হলে তোমাদের ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিত। যত সব বাজে ব্যাপার।

—আপনি আবার উত্তেজিত হচ্ছেন—রজত সেন বললেন, অনেক কথা বলেছেন, আর নয়। এবার—

—বাধা দিওনা ডাক্তার। আমার হৃদয় দুর্ব্বল ঠিকই, তাবলে কথা বলতে বলতে এখনই ফৌৎ হয়ে যাব না। হ্যাঁ, তোমাদের যা বলেছিলাম—কান খুলে তোমরা শোন, তোমরা স্বার্থপর, তোমাদের আমি ঘেন্না করি। তবু বিশ্ববিদ্যালয় বা আর কোন প্রতিষ্ঠানে আমার সমস্ত কিছু দান করার আগে তোমাদের একটা সুযোগ দিতে চাই।

এই কথায় ঘরে যারা উপস্থিত আছে তাদের মনে কোন ঔৎসুক্য দেখা দিল কিনা তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামালেন না বিরাজমোহন।

সোজা হয়ে বসলেন এবার। একটু ঝুঁকে, হাত নীচু করে পিকদানিটা তুলে নিলেন। পানের অবশিষ্টাংশ জলাঞ্জলী দিয়ে আবার নামিয়ে রাখলেন পিকদানি।

—যা বলছিলাম—তিনি আবার বললেন, তোমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন সময় আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছো। অবশ্য ধার বলেই নিয়েছো, কিন্তু এখনও শোধ দাওনি। এতো তোমাদের আত্ম-সম্মান বোধ। তোমাদের এখন আমি দুমাস সময় দিচ্ছি। এই সময়ের মধ্যে যারা যারা টাকা শোধ দিয়ে দেবে, আমি নিজের উইলে তাদের যাতে ভাল ব্যবস্থা থাকে তার ব্যবস্থা করবো।

বিরাজমোহনের এই ধরনের কথা শুনে অপমানে সমস্ত শরীর সুবীরের জ্বলে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক ধনী হতে পারেন, দাম্ভিক হতে পারেন, প্রতিপত্তিশালী হতে পারেন, তাই বলে নিজের অপদার্থ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে জড়িয়ে তাকে অপমান করার কোন অধিকার আছে ওঁর ?

সুবীর জানলার ধারে বসে ছিল।

উঠে দাঁড়াল।

—বিরাজবাবু—

তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন বিরাজমোহন। তারপরই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই ঘরে এমন কে আছে যে তাঁর উপস্থিতিতেই, তাঁকে এই ভাবে সম্বোধন করতে পারে। জানলার দিকে মুখ ফেরালেন। যুবকটিকে দেখার পরই তার উপস্থিতির কথা স্মরণে এল।

—তুমি কি কিছু বলবে ?

—হ্যাঁ।

—বল, শুনি—

সুবীর রুক্ষ-গলায় বলল, আপনি এমন ভাবে বললেন, যাতে মনে হল আর সকলের সঙ্গে আমিও আপনার কাছে টাকা ধার করেছি। এখানে এখন আমি কেন উপস্থিত রয়েছি তা আপনি ভালই জানেন।

আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। আজ আমি যে এখানে আসছি একথা আমি আপনাকে ফোন করে জানিয়ে ছিলাম। তারপরও—

—কি নাম যেন তোমার ?

—সুবীর সোম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমার বাবা কিন্তু কোন দিন আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেননি। তুমি অবশ্য আজকালকার ছেলে। আজকালকার ছেলেদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধটা প্রবল একথা অবশ্য জানি।

—কেন আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, সেটুকু অনুগ্রহ করে বলে দিলে ভাল হয়।

—বলবো বইকি।

—বলুন ? আমার হাতে সময় কম।

বিরাজমোহন হাসবার চেষ্টা করলেন।

—তোমার হাতে সময় কম থাকলেও উপায় নেই। আজ রাতটা তোমর এবাড়িতেই থাকতে হবে। আমার সমস্ত কিছুই ধীর গতিতে বাঁধা। যা বলবার আমি সকালে তোমাকে বলবো।

—আজ বললে ভাল হত না।

—সব ব্যাপারে জেদ ভাল নয়। যা বলতে চলেছি, তাতে তোমার ভালই হবে। ওই কথাই রইল। কাল সকালে—

কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই বিরাজমোহন কালীনাথের দিকে তাকালেন। কালীনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা আর হল না—প্রণিমা উঠে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ প্রণিমা চুপ করেই বসেছিল। কিন্তু বিরাজমোহনের কথাবার্তা এমন স্তরে পৌছাল, যাতে সেও অপমানিত বোধ না করে পারেনি।

—ক্ষমা করবেন। আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে এসে পড়ায় আমি অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছি। আমার পক্ষে আর চুপচাপ

বসে থাকা সম্ভব নয়। দয়া করে আমার সঙ্গে কথাটা শেষ করে নিন।

সুশ্রী মেয়েটির দিকে বিরাজমোহন তাকালেন।

—তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বল, কি বলবে বল?

প্রণিমা একটু ইতস্তত করল।

—একান্তে কথাবার্তা হলে ভাল হয়।

—আমি হেঁয়ালী পছন্দ করি না। যা বলবার এখানেই বল!

—হেঁয়ালী করিনি। আড়ালে কথা বলতে চাইছিলাম।

—এখানেই বল?

—মা আমাকে পাঠিয়েছেন।

বিরাজমোহন অবাক হয়ে গেলেন।

—মা!!!

—হ্যাঁ। আমার মা—

—তাতো বুঝলাম। আমি কি চিনি তাঁকে?

থেমে থেমে প্রণিমা বলল, চেনেন বলেই তো জানি।

—কি নাম বলতো?

—প্রমীলা কর।

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জবরদস্ত চেহারার বিরাজমোহন একেবারে চুপসে গেলেন। সাপটে ধরল তাঁকে এক বিচিত্র অনুভূতি। ঘরে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তাঁরই উপর নিবদ্ধ। গৃহকর্তার এই ধরনের ভাবান্তরের কারণটা কি অনেকেই বুঝে উঠতে পাচ্ছে না।

বিরাজমোহনের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। শরীর একটু টলে উঠল, তারপরই এলিয়ে পড়লেন বালিসের উপর। উদ্বিগ্ন রজত সেন তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিলেন। নাড়ী দেখলেন গভীর মনসংযোগে। আর সকলের মধ্যেও কিছুটা উৎকণ্ঠা দেখা দিল। যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

বিরাজমোহন কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন।

সোজা হয়ে বসলেন আবার।

বললেন, ভয় পেওনা ডাক্তার। আমি ঠিক আছি।

—খুব একটা ঠিক আপনি নেই—রজত সেন বললেন, সোজা হয়ে বসে থাকবেন না। শুয়ে পড়ুন।

—তুমি যখন বলছো—

বিরাজমোহন নিজেকে আধশোয়া অবস্থার মধ্যে এনে ফেললেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে এখন আগেকার তীক্ষ্ণতা নেই। মনে হয় মনের মধ্যে চিন্তার প্রবল ঝড় চলেছে। প্রণিমা এবার দেখলেন খুঁটিয়ে।

—কাছে এস।

প্রণিমা এগিয়ে এল।

—কি নাম তোমার ?

—প্রণিমা কর।

—খাসা নাম। তুমি ঠিকই বলেছিলে, তোমার সঙ্গে কথাবার্তা সকলের সামনে হতে পারে না। একান্তেই হবে। তবে এখন নয়। আজও নয়।

আজও নয়।

—না। কাল। আজ রাতটা তুমি থেকে যাও এ বাড়িতে।

—কিন্তু—

—তোমার হয়তো কিছু অসুবিধা আছে। কিন্তু কি করবো বল ? এখন আমি ভীষণ ক্লান্ত। বিশ্রাম দরকার।

প্রণিমা আর কিছু বলল না।

বিরাজমোহন নিজের ম্যানেজার কালী নাথ সরকারের দিকে তাকালেন।

—কালীনাথ—

—আজ্ঞে—

—এদের সকলের থাকার আর খাওয়ার ব্যবস্থা কর।

—আজ্ঞে, এখুনি করছি।

—লক্ষ্য রাখবে, কারুর কোন রকম অসুবিধা যাতে না হয়।

—কোন অসুবিধা যাতে না হয়, সেদিকে আমি লক্ষ্য রাখছি কর্তা। আপনারা দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।

কালীনাথের পিছু পিছু সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রজত সেন অবশ্য গেলেন না। আরেক প্রস্থ বিরাজমোহনের দেহ পরীক্ষা করলেন।

বললেন শেষে, ওষুধপত্র সময় মত খাচ্ছেন না মনে হয়।

—তোমার ধারনা ভুল ডাক্তার। ওষুধ নিয়মিত খেয়ে চলেছি। আসল কথা, আজকাল একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছি।

—আপনার শরীরের যা অবস্থা তাতে উত্তেজনা যে ভাল নয় তা আপনি জানেন। আমার একটা সাজেশান নিন। তাহলে—

বিরাজমোহন মৃদু হাসলেন।

—তোমার সাজেশানটা বল—শুনি—।

—চেঞ্জে চলে যান।

—চেঞ্জে—

—হ্যাঁ। আমি সাউথের কোথাও সাজেষ্ট করবো। ধরুণ, উটি। চমৎকার জায়গা। মাস তিনেক থাকুন গিয়ে। চাঙ্গা হয়ে ফিরে আসবেন।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু এখনই তো আমার যাওয়া চলবেনা ডাক্তার। বৈষয়িক কিছু কাজকর্ম হাতে রয়েছে।

রজত সেন বললেন, আমি কি আপনাকে কালই যেতে বলছি কাজকর্ম সেরে নিয়েই যান। আচ্ছা, এবার বলুন তো, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন ওই মেয়েটির মা'র নাম শুনেই কি?

—তুমি ঠিকই অনুমান করেছো।

—ব্যাপারটা কি?

—সে অনেক কথা! বলতে পারো আমার ফেলে আসা জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভাল কথা, কয়েক রাত ভাল ঘুম হয়নি। আজও হবে বলে আমার মনে হয় না। যদি—

রজত সেন দ্রুত গলায় বললেন, কি বলতে চাইছেন বুঝেছি। আপনার কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়া চলবে না। এই স্বাস্থ্যে ও সমস্ত একেবারে খাপ খায় না। আজ রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে দিন। কাল ডঃ মুখার্জ্জীকে ডেকে আনছি—ওঁর সঙ্গে কনসাল্ট করেই যাহোক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

—বেশ।

গোটা কয়েক পান মুখে ফেললেন বিরাজমোহন।

—ডাক্তার—

—বলুন ?

—তোমার কি এখন কোন দরকারী কাজ আছে ?

—কাজ—মানে···চেম্বারে গিয়ে বসতাম আর কি।

—তুমি আমার জীবনের অনেক কিছুই জান। তবে আজ তোমাকে এমন কিছু বলতে চাই যা তোমার জানা নেই। মন ভারী হয়ে উঠেছে। ঘটনাটা খুলে বললে কিছুটা হাল্কা বোধ হয়তো করবো।

—প্রসঙ্গটা বোধহয় প্রমীলা কর সম্বন্ধীয়।

—হ্যাঁ।

—শোনার আগ্রহ আমারও কিছু কম নয়। এককাজ করি বরং ঘণ্টা দেড়েক চেম্বারে কাটিয়ে ফিরে আসি।

—সেই ভাল। রুগীদের একেবারে নিরাশ করা ঠিক হবেনা।

রজত সেন এবার বিদায় নিলেন।

বিরাজমোহন খাট থেকে নামলেন। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বসলেন বড় সোফাটার উপর। পাশের নীচু টেবিলের উপর টেলিফোন রাখা রয়েছে। ক্রোডলের উপর থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে একটা নম্বর ডায়েল করলেন।

কয়েকবার রিং হবার পর সারা পাওয়া গেল।

বিরাজমোহন প্রশ্ন করলেন, অধীর মিত্র আছেন ?

....

—আমি করগুপ্ত কথা বলছি—এই সময় বিরক্ত করার জন্য দুঃখীত—

....

—সে কথা আমি কালীর মুখ থেকে শুনেছি—আপনি কাল কোর্টে যাবার পথে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন—

....

—নিশ্চয়—গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই—এখন কি আপনি খুব ব্যস্ত আছেন—

....

—ব্যাপারটা আর কালকের জন্য ফেলে রাখতে চাইছিলাম না—আসতে পারবেন কি—ব্যাপারটা কি জানেন, আপনার মত ব্যস্ত এটর্ণীকে কিছু বলতেও ভয় করে—

....

—আধঘণ্টার মধ্যে আসছেন—ধন্যবাদ—

বিরাজমোহন রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

ওদিকে—

একতলার পূর্বদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রেমকিশোর সিগারেট ধরাচ্ছিল। কালীনাথ দাঁড়িয়েছিল কাছেই। প্রেম একটা সিগারেট এগিয়ে দিল। দ্রুত হাতে কালী সিগারেট ধরালো। দুজনের মধ্যে এখানে দাঁড়িয়েই কয়েক মিনিট ধরে কথাবার্তা হচ্ছে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রেমকিশোর বলল, আমায় আপনি নতুন কোন কথা শোনাতে পারলেন না কালীবাবু। সবই জানি। টাকা পয়সা থাকলে আমিও ওরকম বোলচাল ঝাড়তে পারতাম।

—মন্দ বলেননি। তবে কি জানেন, কর্তা একরোখা লোক। একবার মুখ থেকে যা বেরিয়েছে তার নড়চড় হবে না।

—তাতো বুঝলাম। কিন্তু আমার কি করার থাকতে পারে বলুন?

—টাকাটা শোধ করে দিন না। আখেরে ভালই হবে আপনার।

—দেব বললেই তো দেওয়া যায় না। চার হাজার টাকা দুমাসের মধ্যে জোগাড় করা কি মুখের কথা।

—তা বটে।

—ও কথা যাক। ওই মেয়েটা কে কালীবাবু?

মুচকি হেসে কালীনাথ বলল, সুন্দরপান। মেয়েটার কথা বলছেন?

—হ্যাঁ, মশাই।

—বলতে পারবোনা। এই প্রথমবার দেখছি কিনা।

—ওর মার নাম শোনার পরইতো মেজকাকা খাবি খেতে আরম্ভ করলেন। একটা গোলমালের গন্ধ পাচ্ছি। একটু খোঁজটোজ নিনতো।

এ আর এমন বড় কথা কি। ইয়ে···দশটা টাকা হবে—মানে, ডোজ পড়লে কাজে উৎসাহ পাই আরকি।

প্রেমকিশোর পকেটে হাত ঢোকালো।

—পাঁচটাকা দিতে পারি।

—তাই দিন।

প্রেমকিশোর সবে মাত্র পকেট থেকে হাত বার করেছে, এই সময় একজনকে দ্রুতপায়ে এই দিকেই আসতে দেখা গেল। দোহারা চেহারা। বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন। বিরাজমোহনের সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে।

না থাকার কথাও নয়, ইনি বিরাজের ছোট ভাই ধীরাজমোহন। অবশ্য নিজের ভাই নন—বৈমাত্র। হাজরা রোডে ওষুধের দোকান আছে। থাকেন এই বাড়িতেই দরওয়ানের মুখ থেকে এই মাত্র শুনেছেন, বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছে। মন তেতো হয়ে উঠেছে তখনই। দাদার কাছে আত্মীয় স্বজনরা ঘেঁসতে থাকুক, তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

কাছে এসেই ধীরাজ প্রশ্ন করলেন, কি মনে করে প্রেমকিশোর?

এই কাকাকে প্রেমকিশোর সুনজরে দেখে না।

বলল উত্তাপহীন গলায়, কি মনে করে মানে?

—বড় একটা আসনাতো, তাই—

—কালেভদ্রে আসি বলেইতো তোমার খুশী হবার কথা। মুখ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে ভীষণ বিরক্ত হয়েছো।

ভারী গলায় ধীরাজমোহন বললেন, গুরুজনদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় আজও শিখলেনা। দাদার শরীর ভাল থাকে না। বাড়িতে ভীড় বাড়লে তিনি অস্বস্তিবোধ করেন বলেই—

—খুব ভাল কথা। এককাজ করলে পারতে। কোন কোন বাড়ির সামনে বোর্ড টাঙ্গানো থাকে দেখেছো তো। তাতে লেখা থাকে, প্রবেশ করিবেন না। কুকুর আছে। তুমিও গেটের উপর একটা বোর্ড লটকে দাওনা। লেখা থাকবে, মূল্যবান গৃহকর্তা অসুস্থ। আত্মীয়স্বজনের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কথাটা শেষ করেই প্রেমকিশোর ওখান থেকে সরে পড়লো।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে ধীরাজমোহন বললেন, দেখলেনতো—

—কি করবেন। কালীনাথ বললেন, যুগের হাওয়া।

—যুগের নিকুচি করেছে। ব্যাপারটা কি বলুন তো? বাড়িতে এত ভীড় কেন?

—কর্তা অসুস্থ। সকলে দেখতে এসেছেন।

—দল বেঁধে?

—তাইতো দেখছি।

—লক্ষণ ভাল ঠেকছে না। প্রেমকিশোর কেন ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে আমিতো জানি। আপনি ছিলেন সে সময়, দাদা যখন ওদের সঙ্গে কথা বলছিলেন?

—ছিলাম।

কালীনাথ এবার আগাগোড়া সমস্ত কিছু বললে। নবাগতা মেয়েটির মা'র নাম শোনার পরই কর্তা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সে

কথাও বাদ দিলেন না। শুনতে, শুনতে ধীরাজমোহনের মুখের উপর শ্রাবনের ঘনঘটা নেমে এল। আর তিনি কথা বাড়ালেন না, নয়নতারা কোন ঘরে আছেন জেনে নিয়ে পা চালালেন।

দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে নয়নতারা তখন গুম হয়ে বসে আছেন। বছর কয়েক আগে বিরাজমোহনের কাছ থেকে পাঁচহাজার টাকা নিয়েছিলেন। টাকাটা যে কোনদিন ফিরিয়ে দিতে হবে ভাবেননি। অবশ্য এখন ফিরিয়ে দিতে পারলে লাভেরই সম্ভাবনা। কিন্তু দেবেন কোথা থেকে ?

দরজার কাছে শব্দ হওয়ায় চমকে মুখ ফেরালেন।

ধীরাজমোহন ঘরে এলেন।

মুখ তার অসম্ভব গম্ভীর। বোনের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে খাটের সামনেকার ডেকচেয়ারে বসলেন জুত করে। মন্থর ভঙ্গীতে সিগারেট ধরালেন। অনায়াস ভঙ্গীতে টান দিলেন বারকয়েক।

—আজ রাতটা তোমরা তাহলে এখানে থাকছো ?

নয়নতারা সঙ্কুচিত হলেন।

—কি করবো বল, দাদা বললেন।

—তাতো বটেই। তারা, একটা কথা না বলে থাকতে পাচ্ছিনা, দাদা নিজের উইলে তোমাদের জন্য কেন ব্যবস্থা রাখবেন বলতে পারো ?

—আমি তার কি জানি। আমি তো দাদার মনের মধ্যে ঢুকিনি। উনি বললেন, আমাদের একটা সুযোগ দেবেন।

—বাজে কথা।

—তুমি বলতে চাও—

ধীরাজমোহন বাধা দিয়ে বললেন, বলার মত কথা আমার কাছে একটাই আছে। কান খুলে শোন। আমি হলাম দাদার সবচেয়ে কাছের লোক। উত্তরাধিকারী বলতে আমি ছাড়া দুনিয়ায় আর ওঁর কেউ নেই।

—উনি তো বললেন, ধার শোধ করে দিলে—

—ঘ্যান ঘ্যান করোনা। তোমাদের বুদ্ধির বলিহারি। এখনও চিনতে পারনি বুড়োকে। বকেয়া টাকা আদায় করবার এটা একটা কায়দা, বুঝলে।

নয়নতারা এবার নিজেকে কিছুটা অসহায়বোধ করতে লাগলেন। কথাটা মিথ্যে নাও হতে পারে। পরে বেশী দেবার লোভ দেখিয়ে ধার দেওয়া টাকাটা আদায় করার ফন্দী। বুড়ো যে ভারী ধড়িবাজ তাতে তো কোন সন্দেহ নেই।

নিজেকে সামলে নিয়ে নয়নতারা বললেন, তুমি ঠিকই বলছো। আমাদের উনি নাচাচ্ছেন।

—নাচিয়ে মজা পাচ্ছেন বলতে পারো। ওই সঙ্গে ধার দেওয়া টাকাও ফিরে পাবার সম্ভাবনা রইল।

—আমি অনেক আশা নিয়ে আছি ছোড়দা।

—কিসের আশা ?

—হুটো মেয়ে এখনো বাকী। তাদের বিয়ে দিতে হবে। ভেবেছিলাম—

—মেয়েদের বিয়ের জন্য চিন্তা করো না।—কিছুটা নরম গলায় ধীরাজ বললেন, আমি তো রয়েছি। দাদার সমস্ত কিছু হাতে এসে পড়লে আমিই ব্যবস্থা করে দেব।

—দেবে তুমি !

—আমি এক কথার মানুষ সবাই জানে। তবে প্রেমকিশোরের কোন আশা নেই। ছোঁড়া ভারী বজ্জাত। দেখলে অবশ্য বোঝার উপায় নেই, থাকে ভিজে বেড়ালের মত। ভাল কথা, একজোড়া নতুন মুখ বাড়িতে এসেছে নাকি ?

—তোমায় কে বলল ?

—কালীবাবুর মুখে শুনলাম। আরো শুনলাম, মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার সময়ই দাদা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

নয়নতারা আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছেন।

বললেন উৎসাহের সঙ্গে, আর বল কেন? সে এক কাণ্ড। মেয়েটা যেই নিজের মায়ের নাম বলল, অমনি উনি নেতিয়ে পড়লেন।

—নেতিয়ে পড়লেন।

—তবে আর বলছি কি?

—তারপর—

—তারপর আর বিশেষ কিছু নেই। সুস্থও হয়ে উঠলেন মেজদা সঙ্গে সঙ্গে, রাতটা আমাদের থেকে যেতে বললেন।

ধীরাজমোহনের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

কয়েকমিনিট কি চিন্তা করে নিয়ে বললেন, নতুন যে ছেলেটা এসেছে, মেয়েটার কেউ হয় নাকি?

—হয় না বলেই-তো মনে হল।

—হুঁ! মেয়েটার মায়ের নাম কি?

—চামেলি বলল বোধহয়।

—সবই-তো আন্দাজে চালাচ্ছ দেখছি। ভেবে-চিন্তে বলনা, নামটা চামেলি না, আর কিছু?

নয়নতারা এবার দ্রুত গলায় বললেন, বলতে ভুল করেছি। নামটা চামেলি নয়, প্রমীলা কর।

ধীরাজমোহনের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

তারপর বাঁকা হাসি দেখা দিল।

—সেই হাফগেরস্থ মেয়ে মানুষটা। তার নাম শুনে দাদা নেতিয়ে পড়লেন কেন? নতুন করে নাটক আরম্ভ হচ্ছে তাহলে!

—তুমি চেন ওদের?

—চিনি না, জানি।

—কি রকম?

—বয়সকালে দাদা একটু ইয়ে ধরনের ছিলেন জানোতো? প্রমীলাকে তখনই ম্যানেজ করেছিলেন। তারপর—

—তুমি এসমস্ত জানলে কি করে ?

বিজ্ঞের হাসি হেসে ধীরাজমোহন বললেন, জানি বলেই তো বলছি।

—কিভাবে জানলে তাই বল না ?

—গতবছর দাদা দিন কুড়িকের জন্য পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন। ওই সময় ওঁর কাগজপত্র একটু ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম।

এর সঙ্গে প্রমীলা করের সম্পর্ক কি ?

—আছে—আছে। ব্যস্ত হয়োনা, বলছি। দাদার নিয়মিত ডায়রী লেখার অভ্যাস আছে তুমি বোধহয় জান না। ডায়রীগুলো পড়তে পড়তেই অনেক কিছু জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা, একটা দুঃশ্চিন্তা যে আমায় পেয়ে বসেছে।

—আবার কি হল ?

—ছুঁড়িটা হঠাৎ এল কেন ?

—তাইতো, এল কেন ?

—এমন নয়তো, প্রমীলা কর মেয়েকে লেলিয়ে দিয়েছে। সে এখন নিজেকে দাদার মেয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় আছে।

--আশ্চর্যের কিছু নয়।

—তাই যদি হয়—

নয়নতারার মুখে এবার বাঁকা হাসি দেখা দিল।

বললেন, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সেই তালেই আছে। যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, ওই ছুঁড়িটা মেজদার মেয়ে, তাহলে কিন্তু তুমি অথৈ জলে গিয়ে পড়বে। ভাইয়ের চেয়ে মেয়ের অধিকার অনেক বেশী জানোতো ?

—হুঁ। ভাবিয়ে তুলল দেখছি। তারা, এককাজ করলে হয়না—

—কি কাজ—

—মেয়েটাকে সরাতে হবে। তুমি যদি একটু গা লাগাও তবেই সম্ভব।

এরপর নয়নতারা আর ধীরাজমোহনের মধ্যে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। প্রণিমাকে ঘিরেই আলোচনা পাক খেলো বলা বাহুল্য।

রাতের খাওয়া শেষ হল সাড়ে নটার মধ্যেই।

সন্ধ্যার মুখেই এ্যাটর্ণী অধীর মিত্র এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। হাতে প্রচুর কাজ ছিল, তবু আসতে হল তাঁকে। পয়সাওয়ালা ক্ল্যাইন্টদের চটানো যায় না। রজত সেন অবশ্য পূর্ব-কথামত এসে ছিলেন। কিন্তু অধীর মিত্রকে দেখে বিদায় নিলেন। বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যে তাঁর থাকাটা ঠিক নয়। এরপর বন্ধ ঘরের মধ্যে বিরাজমোহন আর মিত্রর বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়েছিল।

কালীনাথই সকলকে ডেকে আনলো খাবার ঘরে।

খাবার টেবিলে কথাবার্তা বিশেষ হয়নি। বিরাজমোহন গম্ভীর মুখেই খেয়ে গেছেন। নয়নতারা আর ধীরাজমোহন মাঝে মধ্যে দুচার কথা বলেছেন। এই পরিবেশ একেবারেই ভাল লাগছিল না প্রণিমার। মার কথা মনে রেখে, আর সোনারপুরের দূরত্বটা অনেক ভেবেই এখানে রয়ে গেছে আজকের মত। সকালে নটার ট্রেনটা ধরবে স্থির করে রেখেছে। অবশ্য তার আগে মার কাছ থেকে আনা চিঠিখানা বিরাজমোহনকে দেবে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর প্রণিমা সিঁড়িতে পা দিল। তার জন্য দোতলার ঘর নির্দিষ্ট হয়েছে। কয়েক ধাপ উঠে যাবার পর পিছনে শব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল। বিরাজমোহন উঠে আসছেন।

—শোন—

উনি বললেন।

—তখন একটা কথা জেনে নেওয়া হয়নি।

প্রণিমা থামল।

—তুমি এলে কেন? তোমার মা আসতে পারতেন।

—তাঁর শরীর তেমন ভাল নেই। হয়তো—দেখুন, আমি ঠিক জানিনা তিনি নিজে কেন এলেন না।

—কোন চিঠি দিয়েছেন?

বিরাজমোহন প্রণিমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—হ্যাঁ।

—চিঠিখানা কোথায়?

—এই যে—

প্রণিমা তাড়াতাড়ি ব্লাউজের মধ্যে থেকে খামে মোড়া চিঠিখানা বার করলো। খামখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন উনি। তারপর ড্রেসিং গাউনের পকেটে চালান করে দিলেন।

—শুয়ে পড় গিয়ে। কাল সকালে তোমার সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলবো।

প্রণিমা আর দাঁড়াল না। দ্রুত উঠে গেল উপরে। ঘরে এসে দেওয়াল হাতড়ে আলো জ্বালল। ঘরের ওধারে একটা ঝোলা বারান্দা। ক্লান্তভাবে ওখানে এসে দাঁড়াল প্রণিমা। নীচেকার বাগান আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে। এধারের প্রতিটি ঘরের সঙ্গে ঝোলা-বারান্দা যুক্ত। প্রণিমা হাই তুলল। নভেম্বর মাস শেষ হতে চলল, অথচ ঠাণ্ডার নাম গন্ধ নেই। আরেকবার হাই তুলে ফিরে এল ঘরে।

আলো নিভিয়ে দিল।

গা ঢেলে দিল বিছানায়।

ওদিকে—

বিরাজমোহন নিজের ঘরে পৌঁছে গেছেন। টেবিলের উপর থেকে পানের ডিবেটা তুলে নিলেন। তুটো পান ফেললেন মুখে। পানে অল্প মাত্রায় জর্দা দেওয়াই থাকে। অন্যান্য দিনের মত আজ নেশায় তেমন জুত পাচ্ছেন না। চিন্তার পোকা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে মাথার মধ্যে।

ধীরাজ ঘরে ঢুকলেন।

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ভায়ের দিকে বিরাজমোহন।

—কিছু বলবে ?

—বাড়িতে বড় ভীড় বেড়ে গেছে। তুমি ওদের রাত্রে এখানে থাকতে বলেছো নাকি ?

—কৈফিয়ত চাইছো ?

—না……মানে……

—বাড়িটা আমার, একথা নিশ্চয় তোমাকে নতুন করে মনে করিয়ে দিতে হবে না ? কাকে আমি এখানে থাকতে বলবো, আর কাকে থাকতে বলবো না, তা আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করবে।

ধীরাজমোহন থতমত খেলেন।

—তা তো বটেই। মানে……

কথা বাড়িও না। নিজের ঘরে যাও।

ধীরাজ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

—শোন—

থামলেন কনিষ্ঠ। উৎসুক ভাবে তাকালেন জ্যেষ্ঠের দিকে।

শুনেছো বোধহয়, আমি সকলকে জানিয়ে দিয়েছি, দুমাসের মধ্যে ধার নেওয়া টাকা যে ফেরত দেবে, তার ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করবো।

—শুনেছি।

—ওষুধের দোকান ষ্টার্ট করার সময় তুমি আমার কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা নিয়েছিলে। টাকাটা ফেরত চাই না। চাইলেও দিতে পারবে না জানি। তোমাকে শুধু এই বাড়ি ছাড়তে হবে। সামনের মাসের প্রথম দিকেই তুমি অন্যত্র নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে আশা করছি।

—কিন্তু দাদা—

—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। কারণ আমি সম্পূর্ণ ঝাড়া হাত পা হবার পরই তোমাদের সম্পর্কে বিবেচনা করবো।

ধীরাজমোহন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

—বেশ।

—একটা বাসা দু একদিনের মধ্যেই ঠিক করে নাও। সামনের মাসের প্রথম দিকেই উঠে যাবে। এখন যেতে পারো।

মাথা নীচু করে ধীরাজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিরাজমোহন চাবি সমেত তালাটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। ছিটকিনি লাগালেন। তারপর দুই পাল্লার সঙ্গে যুক্ত, পেতলের কড়া দুটোয় তালা পরিয়ে চাবি দিলেন। দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বসলেন সোফায়। ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে প্রণিমার দেওয়া খামটা বার করে আনলেন এবার।

অল্প দামী খাম।

খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করে পড়তে আরম্ভ করলেন—

মান্যবরেষু,

আমার চিঠি পেয়ে তুমি বিরক্ত হবে জানি। তবু না লিখে থাকতে পারলাম না। খবর পেয়েছি তুমি অসুস্থ। নিজে গিয়ে দেখে আসার সাহস হল না। প্রণিমাকে পাঠালাম। তোমার মেয়ে এখন কতবড় হয়ে গেছে দেখো। ওকে সব কথাই বলেছি। আমাদের সম্পর্কে কি ভাবছে জানি না।

তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো কামনা করি। তারপর যদি অনুমতি দাও, তবে এক বার গিয়ে দেখে আসবো। প্রণাম নিও

প্রমীলা।

চিঠিখানা দুবার পড়লেন বিরাজমোহন। খামের মধ্যে ভরে আবার পকেটে রাখলেন। ফেলে আসা দিনের অনেক কিছু মনের

পর্দায় ভেসে উঠছে। প্রণিমা—তাঁর মেয়ে, ভারী মিষ্টি দেখতে হয়েছে। সে যে নিজের মায়ের পাপকে ক্ষমা করে এখানে এসেছে, এও কম কথা নয়।

বিরাজমোহন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

খাওয়া দাওয়ার পর সুবীর তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে এসে ঢুকলো। মনের অবস্থা তার সুবিধার নয়। পিতৃবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে বেশ ঝামেলায় পড়ে গেছে। মোট কথা, বিরাজমোহনকে তার পছন্দ হয়নি। ভদ্রলোক ধনী হতে পারেন, ভদ্র নন।

সুবীর খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

সিগারেট ধরালো।

এখন সে সরাসরি ধানবাদ থেকেই আসছে। কর্মস্থলও ওখানে। নামকরা মেডিক্যাল কম্পানীর স্থানীয় প্রতিনিধি। ইউনিয়ানের রেষ্টহাউসে থাকে। অবসর সময় হৈ-হৈ করে কাটিয়ে দেয়। দায়-দায়িত্বও বিশেষ নেই। নিজের বলতে আছেন একমাত্র মা। তিনি থাকেন কৃষ্ণনগরে। অর্থাৎ দেশের বাড়িতে।

মাঝে মাঝে যায় বাড়িতে, মার সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে আসে। বিয়ের ব্যাপারে উনি তাড়া দেন। বিয়ের ব্যাপারে সুবীরের অনিচ্ছা নেই। তবু সে হেসে পাশ কাটিয়ে যায়। এই ভাবেই চলছিল। বিরাজমোহনের চিঠিখানা পেল মাস দুয়েক আগে।

চিঠিখানা কৃষ্ণনগরের বাড়ি থেকে রিডাইরেক্ট হয়ে এসেছিল। বিরাজমোহন লিখেছিলেন, তিনি ওর পিতৃবন্ধু। বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে চান। সুবীর অবিলম্বে তাঁর কলকাতার বাড়িতে এলে খুশী হবে।

বিরাজমোহন করগুপ্ত নামে কাউকে সুবীর চেনেনা। বাবার মুখেও তাঁর নাম কখনও শোনেনি। তিনি বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন। সুবীর চিঠিখানাকে বিশেষ গুরুত্ব দিল না। এরপর ভুলেই গিয়েছিল।

চিঠির ব্যাপারটা তাজা হয়ে উঠল আবার গত সপ্তাহে। ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল। কৃষ্ণনগর পৌঁছবার পরের দিন সুবীর একটা চিঠি পেল। কোন এক কালীনাথ ঘোষ লিখেছেন বিরাজমোহনের শরীর খুব খারাপ। এ যাত্রায় সেরে উঠবেন কিনা সন্দেহ। তিনি বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে চান। আগামী ২৩শে নভেম্বর এলে সব দিক দিয়ে ভাল হয়।

আবার বিরাজমোহন ?

সুবীর মার কাছ থেকে জানতে চাইল, এই নামে তিনি কাউকে চেনেন কিনা। জানা গেল খুব ভাল ভাবেই চেনেন। কর্তার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এ বাড়িতেও এসেছেন কয়েকবার। এবার সুবীরের কাছে বিরাজমোহনের গুরুত্ব বেড়ে গেল। তাছাড়া মাও বললেন, উনি যখন দেখা করতে চাইছেন তখন দ্বিধা না করে তোমার নিশ্চিত ভাবে যাওয়া উচিত।

এরপরই কলকাতা চলে এসেছে।

কিন্তু এখানকার হালচাল দেখে ঘাবড়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই সুবীর সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে, খোলা বারান্দা ছেড়ে ঘরে এল। গা ঢেলে দিল বিছানায়।

সচকিত হয়ে প্রণিমা বিছানায় উঠে বসলো।

দরজায় মৃদু করাঘাত হচ্ছে। ঘুম না আসায় বিছানায় এপাশ ওপাশ করছিল বলেই শব্দটা শুনতে পেয়েছে। দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল। এগারটা বেজে গেছে কয়েক মিনিট আগে। এত রাতে আবার কে এল ?

আবার করাঘাত। এবার একটু জোরে।

একটু ইতস্ততঃ করে প্রণিমা দরজা খুলে দিল।

নয়নতারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ল প্রণিমা, আপনি! এত রাত্রে?

—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কাল বলবেন। এখন—

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়েই নয়নতারা বললেন, কাল নয়, আজই। সকলের সামনে বলা যাবে না। তাই এখন আসতে হল।

তিনি প্রণিমাকে আপত্তি করার আর কোন সুযোগ না দিয়ে, একরকম জোর করেই ঘরে প্রবেশ করলেন। স্বভাবতই তিনি একটু বেপরোয়া ধরনের। এই অভদ্রতায় প্রণিমা বিলক্ষণ বিরক্ত হল।

রাগত গলায় বলল, এই জুলুমের কোন মানে হয় না।

—জুলুম আবার কি? বললাম না, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—আমি আপনাকে চিনি না। এটা জুলুম ছাড়া কি? কোন কথাই আমার সঙ্গে আপনার থাকতে পারে না।

টেনে টেনে নয়নতারা বললেন, কথার তো বেশ বাঁধুনী আছে দেখছি। যা বলতে এসেছি, কান খুলে শোন। কাল ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

—আপনার হুকুমে?

বলতে পার।

—কেন? আপনার কথাতে আমি এ বাড়িতে আছি তা নয়। আপনি বললে আমি যাব কেন?

তীক্ষ্ন গলায় নয়নতারা বললেন, ভেবেছিলাম, ইসারাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবে। কিন্তু তুমি যে এত বোকা ভাবতে পারিনি। পরিস্কার করেই বলি তাহলে, তোমার মা'র সঙ্গে এ বাড়ির কি সম্পর্ক ছিল আমি জানতে পেরেছি। ওই বিশ্রী ব্যাপারটা আরো জানাজানি হোক আমি চাইনা। তোমাকে তাই ভোরেই এ বাড়ি ছাড়তে বলছি।

অপমানে প্রণিমার মুখ লাল হয়ে উঠল।

দ্রুত গলায় বলল, বাজে কথা বলবেন না। কি জানেন আপনি?

—তুমি কি চাও, সেই সমস্ত নোংরা কথা পরিস্কার করে বলি ?

—বেরিয়ে যান ঘর থেকে। আপনার মত মহিলার মুখ দেখাও পাপ। দাঁড়িয়ে থাকবেন না আর, আমি বলছি বেরিয়ে যান—

নয়নতারা ঠিক এতটা আশা করেন নি।

ধীরাজমোহনের কথায় এ ঘরে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন, একটু চোটপাট করলেই মেয়েটা সরে পড়বে বাড়ি থেকে। কিন্তু এমন ভাবে যে ফুঁসে উঠবে ভাবা যায়নি।

এখন ব্যাপারটা হিসাবের বাইরে চলে যাচ্ছে।

গলা চড়িয়ে নয়নতারা বললেন, কি বললে ! আমাকে—

—হ্যাঁ। আপনাকে। বেরিয়ে যেতে বলেছি ঘর থেকে।

সুবীরের ঘরখানা লাগোয়া।

গোলমালের শব্দ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল। দ্রুতপায়ে চলে এল ঘটনাস্থলে। অবাক হয়ে গেল দুই মহিলার ভাবভঙ্গী দেখে।

—কি হয়েছে ?

—দেখুন না—প্রণিমা বলল, রাত দুপুরে এই মহিলা এসে আমায় যা তা বলে অপমান করছেন।

নয়নতারা ঝলসে উঠলেন, যা সত্যি তাই বলেছি। মান অপমানের জ্ঞান থাকলে তুমি এ বাড়িতে পা দিতে না।

—আমাকে এ সমস্ত কথা বলতে এসেছিলেন কেন ? এ বাড়ি আপনার দাদার।

—তাঁকে বললেই পারতেন। তিনিই আমাকে থাকতে বলেছেন।

নয়নতারা আর দাঁড়ালেন না।

জোরে জোরে পা ফেলে মিলিয়ে গেলেন বারান্দার বাঁকে।

সুবীর প্রশ্ন করল, কি বলছিলেন উনি ?

প্রণিমা বিব্রত হল।

—এমন কি বলছিলেন যা—

—আমাকে বোধহয় বলা যাবে না ?

—না।

—প্রশ্নটা করার জন্য দুঃখিত। শুয়ে পড়ুন এবার। চলি—

সুবীর নিজের ঘরের দিকে এগুলো।

প্রণিমার ঘর থেকে ফিরে আসার পর অনেকক্ষণ সুবীর জেগেছিল। মনের মধ্যে দোল দিয়ে যাচ্ছিল নানা কথা। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পারেনি।

ঘুমটা ভাঙ্গল কিন্তু আচমকাই।

তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসার পরই, ঘুম ভাঙ্গার কারণ বুঝতে পারলো। দরজায় কে করাঘাত করছে। বিছানা থেকে নামার মুখেই জানালার দিকে দৃষ্টি পড়ল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। এই কাক-ভোরে তাকে আবার কে ডাকছে।

সুবীর গিয়ে দরজা খুলল।

প্রণিমা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে সুবীর প্রশ্ন করল, কি হয়েছে?

—আমার ঘরে চোর ঢুকেছিল।

—বলেন কি! দরজা খোলা রেখেছিলেন?

—আপনি চলে আসবার পরই বাড়ির ভেতরের দিকের বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

—চলুন, গিয়ে দেখি।

—সে তো ভেতর বাড়ির দিকে পালিয়েছে। দেখুন, মানে··· আমার ভীষণ ভয় করছে। তাই আপনাকে এই ভাবে—

—সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আপনি তো কাঁপছেন দেখছি! বলুন তো কি হয়েছিল? তার আগে ভেতরে এসে বসুন।

প্রণিমা সুবীরের পিছু পিছু ঘরের মধ্যে গেল।

বসল চেয়ারটায়।

থেমে থেমে বলল, বলতে গেলে সারা রাতই আমি জেগে আছি! একে নতুন জায়গা, তার উপর ওই মহিলার কাণ্ডকারখানা—ঘুম

আসবে কোথা থেকে ? কিছু পত্রপত্রিকা ছিল ঘরে। সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ওগুলোর উপরই চোখ বোলালাম। তারপর আলো নিভিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকি আরো কিছুক্ষণ। তন্দ্রার মত এসেছিল। এই সময়—

—লোকটা ঘরে ঢুকলো কি ভাবে ?

—খোলা বারান্দার দরজা দিয়ে।

—তার মানে দরজাটা আপনি বন্ধ করেন নি ?

—গরম লাগছিল বলে খোলা রেখেছিলাম। তাছাড়া দোতলায় ভয়ের কোন কারণ থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়নি। লোকটাকে দেখার পর এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে চেঁচাতে পর্যন্ত পারিনি।

—তারপর ?

—সে কিন্তু আমার দিকে আসেনি ! ঘরে অপেক্ষাও করেনি। ভেতর বাড়ির বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে সরে পড়েছে।

চিন্তিত গলায় সুবীর বলল, বিচিত্র ব্যাপার। দোতলার পথ দিয়ে চোর ঢুকলো। তারপর ভেতর বাড়ির দিকে চলে গেল। তাও আবার ভোরবেলা।

প্রণিমা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ঘটনাটা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি বলতে চাইছেন, আমি মিথ্যে কথা বলছি !

—এই দেখুন, আপনি আমার উপর রেগে যাচ্ছেন। ব্যাপারটার মধ্যে একটা খাপছাড়া ভাব থাকায় আমি স্বাভাবিক কারণেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। চলুন, দেখা যাক লোকটা কোথায় গেল।

প্রণিমা আর কিছু বলল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজনে।

টানা বারান্দা খাঁ খাঁ করছে।

ওরা প্রণিমার ঘরের মধ্যে দিয়ে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নীচে থেকে এর উচ্চতা ষোল ফিটের কম হবে না। চোর বা যেই

হোক সে উঠল কি ভাবে। দেওয়ালে একটা খাঁজ পর্যন্ত নেই। একই ধরনের ঝোলা বারান্দা দুপাশের দুটো ঘরেও রয়েছে। প্রণিমা জানে, একটাতে সুবীর ছিল, অন্যটায় বিরাজমোহন। বাড়ির আর কে কোন ঘরে আছেন তা তার জানা নেই।

সুবীর বলল, লোকটা তো ভেতর দিকে গেছে। নীচে নেমে গেছে নিশ্চয়। ওদিকেই যাওয়া যাক, চলুন—

দুজনে আবার ঘর পেরিয়ে ভেতর দিকের বারান্দায় এল।

তখনও সেখানে কেউ নেই।

বিরাজমোহনের ঘরের দরজাটা সিঁড়ির মুখেই। দরজার পাশেই বড় একটা জানলা। বন্ধ কাচের পাল্লার মধ্যে দিয়ে মৃদু আলোর আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। জানলার পাশ দিয়ে যাবার সময় সুবীর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বেডরুম ল্যাম্পের নীলচে আলোয় ঘরের চারিধার কেমন আবছা হয়ে রয়েছে। তবু সুবীরের দেখতে অসুবিধা হল না, কে একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে মেঝের উপর!

—কি হল?

মুখ ফিরিয়ে সুবীর বলল, ঘরের মধ্যে দেখুন।

প্রণিমা এগিয়ে এসে দৃশ্যটা দেখলো।

সুবীর আবার বলল, এই ঘর তো বিরাজবাবুর—

কাঁপা গলায় প্রণিমা বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু—

—তাহলে উনিই পড়ে রয়েছেন ওই ভাবে।

—অসুস্থ মানুষ। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে বোধহয় পড়ে গেছেন।

-অজ্ঞান হয়ে গেছেন বোধহয়। কি করা যায় বলুন তো?

প্রণিমা কিছু বলার আগেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল তারপরই দেখা গেল কালীনাথ উপরে উঠে আসছে। তার চাল চলনে কোন ব্যস্ততা নেই। গুণ গুণ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে

সিঁড়ির মাথায় এসেই থমকে গেল। এই সময় কাউকে দেখতে পাবে এখানে আশা করেনি।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, আপনারা—

—চোর এসেছিল।

—চোর!

প্রণিমাকে দেখিয়ে সুবীর বলল, এঁর ঘরে চোর ঢুকেছিল! কোথায় পালাল তাই আমরা দেখছিলাম।

—বলেন কি! আমি নীচে কাউকে দেখলাম না তো। তবে আমার সাড়া পেয়ে ঘাপটি মেরে কোথাও বসে থাকতে পারে। কিন্তু—

একটা কথা মনে হওয়ায় সুবীর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, এত সকালে আপনি উপরে এলেন—

—আমি নিয়মিত এই সময় আসি। কর্তাকে ঘুম থেকে তুলে দিই। তারপর উনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ বাগানে বেড়ান।

—আজকের অবস্থাটা অন্য রকম। মনে হচ্ছে বিরাজবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওই দেখুন···

কালীনাথ কাচের পাল্লার উপর ঝুঁকে পড়ল।

তারপরই দ্রুত গলায় বলল, কি সর্বনাশ। কর্তা ওইভাবে পড়ে আছেন কেন? দরজা ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ করল কালীনাথ। ভারী পাল্লার দরজা ভেতর দিক দিয়ে বন্ধ। একচুল নড়লো না। সুবীরের বুঝতে অসুবিধা হল না, এই দরজা ভাঙতে গেলে বেশ কয়েকজন লোকের দরকার। কালীনাথও বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা।

সে দ্রুত অদৃশ্য হল নীচে।

মিনিট দশেক পরের দৃশ্য অন্যরকম।

বাড়ির সকলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। জানলা দিয়ে দেখেছেন দৃশ্যটা। সকলের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। এবার অবশ্য দরজা ভেঙে ফেলতে কোন অসুবিধা দেখা দিল না। পাল্লা দুটো ঝুলে পড়তেই

হুড়মুড় করে সকলে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

নয়নতারা প্রথমে কথা বললেন।

—মেজদার একি হল? অসুস্থ মানুষ, ওঁর কি রাতে একা থাকা উচিত। কারুর কথাতো শুনবেন না—

—তুমি থামবে কি?

ধমকের সুরে বোনকে কথাটা ব ল ধীরাজমোহন আর সকলের দিকে তাকালেন।

—ওঁকে বিছানায় শোয়ানো দরকার।

ধরাধরি করে বিরাজমোহনকে বিছানায় শোয়ানো হল। সোজা করে শোয়ানো গেল না। শরীর কুঁকড়ে গেছে। শক্ত হয়ে উঠেছে। কপাল আর নাকের উপরকার চামড়া ছড়ে গেছে।

চরম কথাটা শোনাল প্রেমকিশোরই।

—উনি মারা গেছেন।

দ্বিধাজড়িত গলায় ধীরাজমোহন বললেন, অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকতে পারেন। অনেক দিন আগে একবার, কালীবাবু, আপনি তো—

—বাথরুমে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রেমকিশোর আবার বলল, আমি বলছি, উনি মারা গেছেন।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। ডাক্তারবাবুকে খবর দিই বরং—

কালীনাথ এগিয়ে গেল ফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে।

নয়নতারা কান্না-ভেজা গলায় কি সমস্ত বলে চলেছেন বোঝা গেল না। সুবীর এই সময় লক্ষ্য করল, প্রণিমা ঘরে নেই। সুবীরও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বারান্দায় পা দিয়েই দেখল, রেলিং ধরে প্রণিমা দাঁড়িয়ে আছে। জল গড়িয়ে পড়ছে তার ত্বচোখ বেয়ে।

সুবীর দ্রুত তার কাছে এগিয়ে গেল।

—কি হয়েছে।

তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুখ মুছলো প্রণিমা।

—কিছু না।

—কিছু একটা হয়েছে। আমাকে বোধহয় বলা চলে না?

—আপনাকে—

সুবীরের গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল, আমি আপনার অপরিচিত। এই বাড়িতেই দুজনের প্রথম দেখা। তবু আমায় বিশ্বাস করতে পারেন। অস্বস্তিকর এই পরিবেশে হয়তো আমি আপনার কাজে লাগতে পারি।

ভেজা চোখে সুবীরের দিকে তাকাল প্রণিমা।

বলল কাঁপা গলায়, উনি আমার বাবা ছিলেন।

—বিরাজবাবু !!!

—হ্যাঁ।

—কিন্তু—

—আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পেরেছি। বিশ্বাস-করুন, এক সপ্তাহ আগে একথা আমিও জানতাম না।

—আপনাকে বললেন বোধহয়—

—মা। নিজের জন্ম বৃত্তান্ত শোনার পর সমস্ত শরীর ঘৃনায় রি রি করে উঠেছিল। মা এখানে আমায় আসতে বললেন। আসতে চাইনি। কিন্তু বার বার বলতে থাকায় আসতেই হল।

প্রণিমা থামল।

কি বলবে সুবীর ভেবে পেল না।

আবার বলল প্রণিমা, গতকাল এ বাড়িতে এসে ওঁকে দেখার পর বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠেছিল—কিন্তু এখন, চোখের জল চাপতে পাচ্ছি না!

ওদিকে—

খবর পেয়েই রজত সেন চলে এসেছেন।

দেহ পরীক্ষা করার অবশ্য কিছু ছিল না। খালি চোখেই বুঝতে পারা যাচ্ছিল চিকিৎসার বাইরে চলে গেছেন বিরাজমোহন। তবু দেহ পরীক্ষা করার জন্য ডাঃ সেন ঝুঁকে পড়লেন। নানা ভাবে

পরীক্ষা করলেন। ওঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে শুঁকলেন কিযেন।

তারপরই চমকে উঠলেন যেন।

—কি রকম দেখছেন ডাক্তারবাবু?

ধীরাজমোহনের প্রশ্নে রজত সেন মুখ ফেরালেন।

বললেন, অন্ততঃ চার ঘণ্টা আগে মারা গেছেন। বডিতে রাইগার মার্টিস সেট আপ করে গেছে।

—দাদা, সত্যি মারা গেছেন! হে ভগবান, একি হল?

নয়নতারা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

ধমকে উঠল প্রেমকিশোর।

—মড়া কান্না থামাও পিসি। ওর প্রতি তোমার যে কত ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, তাতো সকলেই জানে। থামো দয়া করে। আর লোক হাসিও না। ডাঃ সেন, এবার তাহলে—

সেন বললেন, কি বলুন তো?

—এবার সৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়।

—বডি অবশ্য আর ফেলে রাখা চলে না। তবে আমার মনে হয় না, সৎকারের ব্যাপারটা খুব সহজে মিটবে।

—কেন?

—আমি ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারবো না।

—দিতে পারবেন না কেন?

—সম্ভব নয় বলেই দিতে পারব না। আপনারা আমার কথা শুনুন, যদি ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেতে চান, তবে এখুনি পুলিশে খবর দিন।

পুলিশ!!!

ঘরের মধ্যে যেন এভারেষ্টের চূড়া ভেঙ্গে পড়ল।

সকলে বিহ্বল অবস্থায় তাকালেন ডাঃ সেনের দিকে।

রুক্ষ গলায় বললেন ধীরাজমোহন, পুলিশের কথা উঠছে কেন? এ সমস্ত কি বলছেন আপনি?

রজত সেন বললেন, এখন আমার যা বলা উচিত, আমি তাই বলছি। ওঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি। আমার পক্ষে তাই ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

—আপনি বলতে চাইছেন, উনি আত্মহত্যা করেছেন?

অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে ডাঃ সেন বললেন, আত্মহত্যা কি আর কিছু তার বিচার আমি করব না। ডাক্তার হিসাবে বুঝতে পেরেছি, এটা ন্যাচারাল ডেথ নয়। আমার কাছে এইটুকুই যথেষ্ট। এর পরের কাজ হল পুলিশের। কালীবাবু আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। থানায় খবর পাঠান।

দুশো একচল্লিশের কে হ্যাঙ্গার ফোর্ডাস্ট্রীটের ড্রয়িংরুমে তখন গল্পের আমেজ। অবশ্য কিছুক্ষণ আগে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল রাজনৈতিক। সদ্য সমাপ্ত লোকসভার নির্বাচনের পর এখন দেশের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে তাই নিয়ে দুজনের মতের মিল হচ্ছিল না।

—দেশে পঞ্চাশটা রাজনৈতিক দল—শৈবাল বলেছিল, মাথা ফাটাফাটি করে চলেছে এটা কোন কাজের কথা নয়। দেরী হলেও, শেষ পর্যন্ত যে একত্রিত হয়ে কাজে নামতে পেরেছে, এটা সুবুদ্ধিরই পরিচয় বলতে হবে।

বাসনর দাঁতে পাইপ চেপেই বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমি একমত। তবে কতদিন একসঙ্গে থাকতে পারবে এটাই হল কথা। কিন্তু এ প্রসঙ্গ এবার থাক। বরং—

তখন থেকে আলোচনার মোড় ঘুরে গেছে।

বাসব বলল, কুকুরের সাহায্যে অপরাধীকে ধরবার প্রচলন আজকের পৃথিবীতে সর্বত্র আছে। এরজন্য তাদের যথেষ্ট শিক্ষাও দেওয়া হয়। কিন্তু কুকুর ছাড়াও এমন কিছু জন্তু আছে যাদের আমরা কাজে লাগাতে পারলে উপকৃত হব। অথচ বলতে গেলে সেদিকে

কোন সরকারের দৃষ্টি নেই।

শৈবাল প্রশ্ন করল, তুমি কোন জন্তুর কথা বলছো ?

—বাঁদরের কথাই ধর। তাদের যে বুদ্ধি আছে তাতো আমরা জ্ঞান হয়ে অবধি শুনছি। কিন্তু এই বুদ্ধিমান জীবটিকে কোন পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট কখনও কাজে লাগিয়েছে শুনেছো ?

—না, শুনিনি।

—তবেই দেখ। অথচ কাজে লাগাতে পারলে কুকুরের কান ওরা স্বচ্ছন্দে কেটে দেবে।

বাসব পাইপ ধরাল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, গত উইকের 'নর্দান অবজার্ভার' বোধহয় তুমি দেখনি ?

—দেখেছি। সব আর্টিকাল পড়া হয়নি।

—ওতে একটা সত্য-ঘটনামূলক রচনা আছে ওই রচনার মূল চরিত্র হল একটা বাঁদর।

—কি রকম ?

—উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে—জায়গাটার নাম মনে পড়ছে না—একটা লোক বাঁদরের খেলা দেখিয়ে বেড়াতো। এ-গ্রাম সে-গ্রাম করে রোজগারপাতি সে ভালই করতো। তার পোষা বাঁদরটাও নানা খেলাধূলায় ছিল এক্সপার্ট। একদিন বাঁদরওয়ালা একটা গ্রামে খেলা দেখিয়ে জংলা পথ ধরে অন্য লোকালয়ে যাচ্ছিল। তখন ভরা দুপুর। কিছুদূর যাবার পর সে একটা গাছতলায় বসলো। থলি থেকে খাবার বার করে নিজে খানিকটা নিল, খানিকটা দিল বাঁদরটাকে। আহার পর্ব চলতে লাগল ধীরে সুস্থে।

এই সময় সেখানে যণ্ডামার্কা একজন লোক উপস্থিত হল। বাঁদর-ওয়ালার সঙ্গে হয়তো তার চেনাজানাও ছিল। দু-চার কথার পর সে পকেট থেকে একটা ছোরা বার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঁদরওয়ালার উপর। সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরটা লোকটার পা খামচে ধরল। ছোরার ঘায়ে

বাঁদরওয়ালা তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। আততায়ী ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝটকা মেরে বাঁদরটা ঝেড়ে ফেলল। আবার আক্রমণ করল। আততায়ী এবার ছোরা চালাল। বাঁদরটা অবস্থা বুঝে লাফ দিয়ে গাছে উঠে পড়ল। ওই সঙ্গে ছিঁড়ে নিয়ে গেল আততায়ীর জামার কিছু অংশ। হত্যাকারী এবার আরো বারকয়েক ছোরা চালিয়ে নিশ্চিন্ত হল বাঁদরওয়ালার মৃত্যু সম্পর্কে। তারপর সমস্ত টাকাকড়ি হাতিয়ে, কিছুদূরের আলগা ভেজা মাটির তলায় বডিটা পুঁতে ফেলল।

হত্যাকারী স্থানত্যাগ করার পর বাঁদরটা নেমে এল গাছ থেকে। তারপর রওনা দিল লোকালয়ের উদ্দেশ্যে। কাছাকাছির গ্রামে সেদিন হাটবার। লোকে লোকারণ্য। বাঁদরটা পৌঁছাল হাটে। কয়েকজন লোককে টানাটানি করে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল। যা স্বাভাবিক তাই ঘটল। সোরগোল পড়ে গেল চারিধারে। লাঠি নিয়ে মারতে তেড়ে গেল কয়েকজন। অগত্যা বাঁদর-প্রবর একটা গাছের মগডালে গিয়ে বসল। সেখানে কিছুক্ষণ বসে থেকে প্ল্যান ভাঁজল বোধহয়। তারপর হঠাৎ নেমে এসে একজন অসতর্ক দোকানদারের ক্যাশ বাক্স তুলে নিয়ে লম্বা ছুট দিল জঙ্গলের দিকে। হৈ-হৈ পড়ে গেল। বহুলোক ছুটলো তার পিছু পিছু। গ্রামের চৌকিদারও তাদের মধ্যে একজন।

বাঁদরটা কিন্তু এগাছ ওগাছ করতে করতেই যাচ্ছিল। বলাবাহুল্য সে দুর্ঘটনা স্থলে পৌঁছাল আগে। দ্রুত হাতে মৃতদেহ যেখানে পোঁতা ছিল সেখানকার কিছু মাটি সরিয়ে দিল। তারপর কাছের গাছটায় উঠে বসে রইল। বিস্ময়ের ব্যাপার, বাঁদরটা ক্যাশ বাক্স রেখে এসেছিল মৃতদেহের কাছেই। লোকজনরাও হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পড়লো দুর্ঘটনা স্থলে। তাদের চক্ষুস্থির। শুধু ক্যাশ বাক্স নয়, রক্ত মাখামাখি একটা দেহের কিছু অংশও তারা দেখতে পেয়েছিল। এই তো হল ব্যাপার ডাক্তার। বাঁদরটার চাতুর্য তোমায় অবাক করেনি বলতে চাও?

মৃদু হেসে শৈবাল বলল, করেছে। মৃতদেহ কোথায় আছে সকলে যাতে জানতে পারে, তাই সে টাকার বাক্স নিয়ে দৌড় দিয়েছিল। টাকাটা ফেরৎ পাবার জন্য লোকে তার পিছু নেবেই। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাপার স্বীকার করতেই হচ্ছে।

—তাই বলছিলাম ডাক্তার, এই ধরনের জন্তুদের ট্রেনিং দিয়ে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু বকে বকে আমার গলাতো শুকিয়ে গেল। বাহাদুরের সন্ধান কর না। চা বা কফি যাহোক দিয়ে যাক।

শৈবাল ওঠার উপক্রম করতেই দেখা গেল, বাহাদুর আসছে। মুখ নির্বিকার। হাতে ট্রের উপর দুকাপ ধূমায়িত পানীয়।

ওরা দুটো পেয়ালা তুলে নিল।

—বাহাদুরের বিবেচনা বোধকে তারিফ করতেই হয়।

—শুধু সুখ্যাতি করলে তো ওর পেট ভরবে না। সামনের মাস থেকে ওর দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও।

শৈবাল আরো কিছু বলতে যাবার আগেই পোর্টিকোয় গাড়ী থামার শব্দ হল। এ-সময় আবার কে এল। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো দুজনে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আগন্তুক হাসি মুখে ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন। তিনি আর কেউ নন, হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের বড়-কর্তা পুরন্দর সামন্ত।

মৃদু হেসে বাসব বলল, কি মশাই পথ ভুলে নাকি?

বসতে বসতে সামন্ত বললেন, এ অভিযোগটা বড় পুরানো হয়ে গেছে। আপনি নিজে কতবার আমাদের ওদিক মাড়ান।

—তাহলে কাটাকাটি হয়ে গেল।

—এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, আপনার এখানে ঢুঁ মেরে যাই। কিন্তু আমার চা কই?

—ধৈর্যং রুহ। আমাদের বাহাদুরের কাণ্ডজ্ঞান আছে। এসে পড়লো বলে। তা আপনি এধার দিয়ে যাচ্ছিলেন কোথায়?

—এলগিন রোড।

—কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ?

—না। মানে······

—আর বলতে হবে না। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। হোমিসাইডের বড়কর্তা যখন লালবাজার থেকে বেরিয়েছেন তখন ব্যাপার অবশ্যই গুরুতর। কেসটা কি ?

বিরাজমোহন করগুপ্তর নাম শুনেছেন ?

বাসবের ভ্রু কুঁচকে উঠল।

—না। কোন কেউকেটা লোক নাকি ?

—নাম করা কেউ নয়। বড়লোক ছিলেন। দিন তিনেক হল পটল তুলেছেন।

—অর্থাৎ খুন হয়েছেন।

—ঠিক তাই। ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে।

—স্থানীয় থানার হাত থেকে ব্যাপারটা যখন লালবাজারে গিয়ে পৌঁছেচে তখন গোলমেলে না হয়ে যায় না।

—গোলমাল এড়াবার জন্য কিনা জানিনা, বিরাজমোহনের আত্মীয়-স্বজনেরা মৃত্যুটাকে আত্মহত্যা বলে চালাতে চাইছে। আমরা অবশ্য নিশ্চিত হয়েছি,এটা নির্ভেজাল খুন। যাবেন নাকি ঘটনাস্থলে ?

এই সময় বাহাদুর চা নিয়ে উপস্থিত হল।

সামন্ত পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, সময় তো হাতে প্রচুর রয়েছে। বুদ্ধিতে মরচে ধরিয়ে লাভ নেই। যাওয়া যেতে পারে। তার আগে কিন্তু আপনাকে ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে বলতে হবে।

—অবশ্যই।

সামন্ত পেয়ালা শেষ করে নামিয়ে রাখলেন।

—তবে খুঁটিয়ে বলার মত অবস্থায় আমিও নেই। যতদূর জানি বলছি। বিরাজমোহন খুব সুবিধার লোক ছিলেন না। ব্যবসার একটা ঠাট বজায় ছিল—আসলে তিনি বেআইনি কায়দায় রোজগার-

পাতি করতেন। প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পারায় পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি। বিয়ে থা করেননি। বয়স পঁয়ষট্টির কম ছিল না।

—উত্তরাধিকারী কে ?

—সে কথায় পরে আসছি। আত্মীয়-স্বজনের ফিরিস্তিটা আগে জেনে নিন। ছোট ভাই ধীরাজমোহন দাদার সঙ্গে থাকতো। ওষুধের কারবার আছে। নবব্যারাকপুরে থাকেন এক খুড়তুতো বোন। নাম নয়নতারা। এক ভাইপো আছে ছোকরার নাম প্রেমকিশোর। কারুর প্রেমেট্রেমে পড়েছে কিনা জানি না। 'লারসান অ্যাণ্ড গিবস' কম্পানীতে কাজ করে। এরা ছাড়া আরো দুজন দুর্ঘটনার সময় ওই বাড়িতে উপস্থিত ছিল

—তারা কারা ?

—একজন সুবীর সোম বিরাজমোহনের বন্ধুর ছেলে কৃষ্ণনগর থেকে এসেছিল। দ্বিতীয়জন হল ভারী মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে এই প্রণিমা করের ইতিহাস একটু বিচিত্র ধরনের-জবানবন্দীর কপি আমার সঙ্গেই আছে, পড়লেই বুঝতে পারবেন

—নিশ্চয় পড়বো। তারপর কি হল বলুন ?

—সেদিন বিরাজমোহনের শরীর ও মন ভাল ছিল না। সন্ধ্যার পর নিজের এ্যাটর্ণীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কি সমস্ত পরামর্শ হয়েছিল দুজনের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চুকে যায় দশটার মধ্যে। বাড়ির সকলে শুতে চলে যায় যে যার ঘরে একটা কথা বলা হয়নি, সে রাত্রে নয়নতারা, প্রেমকিশোর, প্রণিমা আর সুবীর বিরাজমোহনের কথায় ওই বাড়িতে থেকে গিয়েছিল।

—ব্যাপারটা ঘটে কখন ?

—পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট অনুসারে রাত সাড়ে এগারটা থেকে একটার মধ্যে। মৃতদেহ অবশ্য আবিষ্কৃত হয় সকালে ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ভেঙ্গে ঢুকতে হয়। তখন সকলে ভেবেছিল স্বাভাবিক

—টিক উডের সাবেকি দরজা। পিতলের ছিটকিনি আছে। এছাড়া লাগানো আছে দুটো কড়াও। গৃহকর্তা প্রত্যহ শুতে যাবার আগে তালা লাগাতেন ওই কড়ায়।

—দুর্ঘটনার দিনও তাহলে—

—হ্যাঁ। তালা লাগানো ছিল।

—বিচিত্র ব্যাপার।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ঘন ঘন টান দিল।

কালচে বাদামী রং-এর ধোঁয়া ওর মুখের উপর কুয়াশা সৃষ্টি করে উপরে উঠে যেতে লাগল। ভ্রূ কুঁচকে ওই তালে চিন্তার জাল বুনলো মিনিট খানেক। তারপর প্রশ্ন করল।

—আচ্ছা মিঃ সামন্ত, ঝোলা বারান্দা ওই একটাই—না, আরো আছে?

—আরো আছে। বাগানের দিকের প্রত্যেক ঘরে একটা করে লাগোয়া বারান্দা। বেশ সুদৃশ্য ব্যাপার আর কি।

মে—বারান্দাগুলোর মাঝের ব্যবধান বোধহয় খুব বেশী নয়?

—ই আড়াই তিন করে হবে।

—কাল ওই রকম মনে হচ্ছিল।

—কালীনা আমরা তৈরী করেছি। আপনি দেখলেই ওই

—বিরাজমোহনের ণা করতে পারবেন।

কালীনাথ চিঠি লেখার কথা

হাতের লেখার সঙ্গে চিঠিগুলো মিলি.

বাসব নড়ে চড়ে বসলো। ওটা কোলে তুলে নিয়ে

লোকটা কেমন? ঘেঁটেঘুটে তার মধ্যে

—ঘোড়েল মার্কা মনে হয়। তবে এক্ষেত্রে সেলন। তারপর

—তার মানে কেউ একজন কালীনাথের নামের অ.

রেখে প্রত্যেককে চিঠি পাঠিয়েছিল। সে চেয়েছিল এ.

সকলে বিরাজমোহনের কাছে আসুক। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?

পাতি করতেন। প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পারায় পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি। বিয়ে থা করেননি। বয়স পঁয়ষট্টির কম ছিল না।

—উত্তরাধিকারী কে?

—সে কথায় পরে আসছি। আত্মীয়-স্বজনের ফিরিস্তিটা আগে জেনে নিন। ছোট ভাই ধীরাজমোহন দাদার সঙ্গে থাকতো। ওষুধের কারবার আছে। নবব্যারাকপুরে থাকেন এক খুড়তুতো বোন। নাম নয়নতারা। এক ভাইপো আছে ছোকরার নাম প্রেমকিশোর। কারুর প্রেমেট্রেমে পড়েছে কিনা জানি না। 'লারসান অ্যাণ্ড গিবস' কম্পানীতে কাজ করে। এরা ছাড়া আরো দুজন দুর্ঘটনার সময় ওই বাড়িতে উপস্থিত ছিল।

—তারা কারা?

—একজন সুবীর সোম বিরাজমোহনের বন্ধুর ছেলে। কৃষ্ণনগ[র] থেকে এসেছিল। দ্বিতীয়জন হল ভারী মিষ্টি চেহারার একটি মে[য়ে] এই প্রণিমা করের ইতিহাস একটু বিচিত্র ধরনের-জবানব[ন্দী] আমার সঙ্গেই আছে, পড়লেই বুঝতে পারবেন [...]আছে।

—নিশ্চয় পড়বো। তারপর কি হল বলুন?

—সেদিন বিরাজমোহনের শরীর ও [...]
সন্ধ্যার পর নিজের এ্যাটর্ণীকে ডেকে [...]চে আমরা একটা মই
পরামর্শ হয়েছিল দুজনের মধে[্য] [...]টা ওখানে থাকাব কথা নয়।
মধ্যে। বাড়ির সকলে শু[...]
বলা হয়নি, সে রাতে [...]ড়ছিল।
বিরাজমোহনের [...]তে চাইছেন, হত্যাকারী ওই পথ দিয়েই ঘরে

—ব্যাপ[...]রে। ভাল কথা, বিরাজমোহন যে দরজা ভেতর

—[...]বছিলেন, তাতে কি ইয়েল লক লাগানো আছে?

এ[...]। আরো পাকা ব্যবস্থা ছিল।

কি রকম?

—টিক উডের সাবেকি দরজা। পিতলের ছিটকিনি আছে। এছাড়া লাগানো আছে দুটো কড়াও। গৃহকর্তা প্রত্যহ শুতে যাবার আগে তালা লাগাতেন ওই কড়ায়।

—দুর্ঘটনার দিনও তাহলে—

—হ্যাঁ। তালা লাগানো ছিল।

—বিচিত্র ব্যাপার।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ঘন ঘন টান দিল।

কালচে বাদামী রং-এর ধোঁয়া ওর মুখের উপর কুয়াশা সৃষ্টি করে উপরে উঠে যেতে লাগল। ভ্রূ কুঁচকে ওই তালে চিন্তার জাল বুনলো মিনিট খানেক। তারপর প্রশ্ন করল।

—আচ্ছা মিঃ সামন্ত, ঝোলা বারান্দা ওই একটাই—না, আরো আছে?

—আরো আছে। বাগানের দিকের প্রত্যেক ঘরে একটা করে লাগোয়া বারান্দা। বেশ সুদৃশ্য ব্যাপার আর কি।

—বারান্দাগুলোর মাঝের ব্যবধান বোধহয় খুব বেশী নয়?

—ফিট আড়াই তিন করে হবে।

—আমারও ওই রকম মনে হচ্ছিল।

—একটা নক্সা আমরা তৈরী করেছি। আপনি দেখলেই ওই বাড়ির দোতলা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

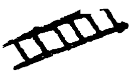
—নক্সাটা কাছে আছে?

—আছে। দেখাচ্ছি।

ব্রীফকেশ মাটিতে নামানো ছিল। ওটা কোলে তুলে নিয়ে খুললেন সামন্ত। প্রচুর কাগজ পত্র রয়েছে। ঘেঁটেঘুটে তার মধ্যে থেকে একটা হাল্কা সবুজ রং-এর কাগজ বার করলেন। তারপর ভাঁজ খুলে বিছিয়ে দিলেন সেন্টার টপের উপর।

বাসব ঝুঁকে নক্সাটা দেখতে লাগল।

মিনিট পাঁচেক পরে বাসব মুখ তুলল।



বাগান

খোলা বারাণ্ডা

জানলা

সুধীর এই ঘরে ছিল

প্রতিমা এই ঘরে ছিল

বিরাজ-মোহনের ঘর

বারাণ্ডা

শেষ রাতের আগন্তুকের পালাবার পথ

নীচে নামার সিঁড়ি

দোতলার এক ধারের নক্সা

অন্যান্যরা সে রাতে নীচের ঘরগুলোতে ছিলেন

সামন্ত প্রশ্ন করলেন, সমস্ত শুনলেন। নক্সাটাও দেখলেন। কি রকম বুঝছেন ব্যাপারটা ?

—এখনই কিছু বলা ঠিক হবেনা। প্রচুর চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। ভাল কথা, জবানবন্দীর কপি টপি কাছে আছে নাকি ?

মৃদু হাসলেন সামন্ত।

—আপনার কাছে যখন এসেছি মশাই, তখন তৈরী হয়েই এসেছি।

উনি এক গোছা কাগজ ব্রীফকেশ থেকে বার করে এগিয়ে ধরলেন।

বাসব কাগজগুলো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—পড়ে দেখি। তারপর হয়তো কিছু আঁচ করা যেতে পারে। আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।

ডাক্তার তুমি ততক্ষণ লক্ষ্য রাখ যাতে সামন্ত সাহেব একঘেঁয়েমির শিকার না হয়ে পড়েন।

সামন্ত ওর স্বভাব জানেন। কাজেই হৃষ্ট চিত্তে তিনি শৈবালের সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। বাসব পাশের ঘরে গিয়ে হ্যারিংটন চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে জবানবন্দীতে মনোনিবেশ করল।

খুঁটিয়ে পড়তে সময় লাগল পঁয়ত্রিশ মিনিট।

ওই বাড়ির প্রত্যেকের জবানবন্দীর সারাংশ নিম্নরূপ—

ধীরাজমোহন

—বয়স ছাপ্পান্ন। প্রায় দশ বছর আগে পত্নী বিয়োগ হয়েছে। আর বিয়ে করেন নি। সন্তানাদি নেই। বৈমাত্রেয় দাদার বাড়িতেই থাকেন। ওষুধের দোকান আছে। চলেভালই। দাদা মূলধন জুগিয়ে ছিলেন। দুর্ঘটনার আগে বিকেলে বা সন্ধ্যার মুখে তিনি বাড়ি ছিলেন না। প্রত্যেক দিন ওই সময় তিনি দোকানে থাকেন। কয়েকজন যে দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন এ কথা তাঁর জানা ছিল না। অতিথিদের আগমন সংবাদ পেয়েছেন, বাড়ি ফিরে আসার পর দাদার বাজার সরকার

কালীবাবুর মুখ থেকে। প্রণিমা কর বা সুবীর সোমকে চেনা দূরের কথা, আগে নাম পর্যন্ত শোনেন নি।

খাওয়ার আগে খুড়তুতো বোন নয়নতারার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলেন। প্রসঙ্গ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। পারিবারিক। তারপর খাওয়া দাওয়াসেরে দাদার শোবার ঘরে গিয়েছিলেন। দু-চারটে সাংসারিক কথা হয়েছিল। বিরাজমোহন তখন বেশ স্বাভাবিক ছিলেন। ওখান থেকে তিনি নিজের ঘরে শুতে চলে যান। একতলার দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরখানা তাঁর। হিসাব-পত্রের কাজ শেষ করে যখন বিছানা নেন, তখন রাত পৌনে বারটা। রাত্রে একবারও বেরোননি ঘর থেকে। সকালে চেঁচামেচির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপর জানতে পারেন দাদার মৃত্যুর কথা। তিনি বিশ্বাস করেন না, দাদাকে কেউ খুন করেছে। স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু না হয়ে থাকলে কেসটা আত্মহত্যার।

নয়নতারা দেবী

—বীরাজমোহনের সম্পর্কে খুড়তুতো বোন। নবব্যারাকপুরের আদর্শ বালিকা বিদ্যায়তনের শিক্ষিকা। থাকেন ওখানে। ওঁর স্বামী রাইটার্সে চাকরী করেন। বয়স বাহান্ন। এখনও বেশ চটপটে আছেন। তিন মেয়ের মা। এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কয়েক বছর আগে। তখন বিরাজমোহন কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন বোনকে। তারপর থেকে এতদিন দাদার বাড়ি আসেননি নানা কারণে। হঠাৎ কালীবাবুর চিঠিতে জানতে পারেন, বিরাজমোহন অসুস্থ। দেখা করতে চেয়েছেন। সেই মত তিনি চলে এসেছিলেন।

দাদার মুখোমুখি হয়ে তাকে কিন্তু হতাশ হতে হয়। কারণ বিরাজমোহন শুধু তাঁকে নয়, উপস্থিত অনেককেই বাঁকা কথা শোনাতে থাকেন। শেষে বলেন, দুমাসের মধ্যে তাঁর কাছ থেকে নেওয়া টাকা যারা শোধ করে দেবে, উইল করার সময় তাদের

সম্পর্কে তিনি বিবেচনা করবেন। গৃহকর্তা থেকে যেতে বলেছিলেন বলেই তাঁর নব ব্যারাকপুর সেদিন ফেরা সম্ভব হয়নি। খাওয়া-দাওয়ার আগে ধীরাজমোহনের সঙ্গে তাঁর কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা নয়। মেয়েদের বিয়ে নিয়ে আলোচনা। সাড়ে দশটার সময় শুয়ে পড়েন। ভোরে ঘুম ভাঙ্গে চেঁচামেচিতে। উনি বিশ্বাস করেন না বিরাজমোহন খুন হয়েছেন। তিনি বদরাগী—মানুষের সম্মানে আঘাত দিয়ে কথা বলতেন। অনেকে তাঁর উপর বিরক্ত ছিল ঠিকই, তাই বলে কেউ তাঁকে খুন করে বসবে এমন হতে পারে না।

প্রেমকিশোর

—বিরাজমোহনের সম্পর্কে ভাইপো। বয়স বত্রিশ বছর। 'সারসান অ্যাণ্ড গিবস' কোম্পানীতে কাজ করে। এখনও বিয়ে করেনি। মেসে থাকে। কালীবাবুর চিঠিতে বিরাজমোহনের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে সেদিন ও-বাড়িতে সে গিয়েছিল। বিরাজমোহন যে তাকে খুব ভাল চোখে দেখতেন বা সে যে জ্যাঠাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করত তা নয়—আসল কথা হচ্ছে আশা ছিল, শেষ পর্যন্ত হয়তো ওঁর উইলে তার নামটা যুক্ত হবে। এই কারণেই সে মাঝে মাঝে ও-বাড়িতে যাওয়া আসা করতো।

দুর্ঘটনার আগের বিকেলে সকলের সামনে জ্যাঠা তার সঙ্গে ভালব্যবহার করেননি। ব্যাপারটা সে অবশ্য গায়ে মাখেনি। কারণ ওঁকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। জ্যাঠার কাছ থেকে একবার কিছু টাকা নিয়েছিল সে। উনি তখন এ-রকম ইঙ্গিতও করেছিলেন, ওই টাকা শোধ করে দিলে উইলে তার জন্য কিছু ব্যবস্থা রাখবেন। সে রাত্রে বাধ্য হয়েই তাকে থেকে যেতে হয়েছিল ওই বাড়িতে। সন্দেহজনক কোন কথা তার কানে আসেনি বা কিছু চোখে পড়েনি। খাওয়া-দাওয়ার পরই শুয়ে পড়েছিল। সকালে ঘুম ভেঙ্গেছে চেঁচামেচিতে।

পুলিশের সন্দেহ মিথ্যা নয়। বিরাজমোহনকে যে কেউ খুন করতে পারে। বদ স্বভাবের লোক অনেককে তিনি জ্বালিয়েছেন। তবে কি ভাবে তিনি খুন হয়েছেন বা কে এই কাজ করেছে সে সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই।

ডাঃ রজত সেন

—বয়স একচল্লিশ। ওই বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বছর পাঁচেকের। বিরাজমোহন হার্টের রুগী ছিলেন। আর্থারাইটিসও ছিল। তাঁর চিকিৎসায় উনি ভাল থাকতেন। ওঁর মত বদরাগী ও স্বাধীনচেতা লোকও চিকিৎসকের কথা মেনে চলতেন। ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে গাফিলতি করতেন না। কয়েকদিন থেকে রাত্রে ওঁর ঘুম হচ্ছিল না। আর্থারাইটিসও চাগাড় দিয়েছিল।

মারা যাবার আগের বিকেলে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। প্রমীলা কর—এই নামটা শোনার পর তাঁর উত্তেজনা আরো বাড়ে। বলতে গেলে এর-পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশ্য নিজেকে সামলে নেন অল্পক্ষণের মধ্যেই। আত্মীয়-স্বজনেরা ঘর থেকে চলে যাবার পর বলেন, জীবনের কিছু গোপন কথা তাঁকে বলতে চান। চেম্বারে কিছু সময় কাটিয়ে ডাঃ সেন যেন আবার এখানে আসেন। সেই-মত তিনি সন্ধ্যার সময় আবার ওই বাড়িতে যান। তখন বিরাজমোহন বলেন, প্রমীলা করের সঙ্গে অবশ্য ওঁর বিয়ে হয়নি, তবে মহিলাকে উনি স্ত্রীর মর্যাদাই দিয়েছিলেন। অবশ্য বহু বছর দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ নেই। পূর্ণিমা তাঁর মেয়ে। মেয়েকে দেখে এখন মন ভরে উঠেছে।

বেশ স্বাভাবিক ভাবেই তখন কথাবার্তা বলছিলেন। অবশ্য ওই আলোচনা বেশীদূর এগোবার অবসর পায়নি। ওঁর এ্যর্টণী অধীর মিত্র এসে পড়েন। বৈষয়িক কোন ব্যাপার আছে আঁচ করেই ডাঃ সেন ওখানে আর অপেক্ষা করেননি। ভোরবেলা

কালীনাথের ফোন পেয়ে ছুটে আসেন আবার। বিরাজমোহন মারা গেছেন শুনে প্রথমে অবাক হননি। হার্টের রুগীর যে কোন মুহূর্তে কোলাপস্ করবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বডির পজিসন দেখে তাঁর কেমন সন্দেহ হয়। সন্দেহ আরো দৃঢ় হয় বডি পরীক্ষা করার সময়—খুব হাল্কা হলেও, মুখ থেকে সায়নাইডের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। ডাঃ সেন ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া বিবেচনার কাজ মনে করেননি। পুলিশে খবর দেওয়ার পরামর্শ দেন। বাড়ির লোকের কারুর কারুর ধারণা এটা আত্মহত্যা।

অধীর মিত্র

—বিরাজমোহনের এ্যাটর্নী। ওঁর আইনঘটিত সমস্ত কাজকর্ম বহুদিন ধরে দেখাশুনা করছেন। অত্যন্ত বদরাগী লোক হলেও, মক্কেল হিসাবে ছিলেন প্রথম শ্রেণীর। ইদানীং স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ছিলেন। খুব বেশী দিন বাঁচবেন না, এই রকম একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল মনে। তাই টাকা-পয়সা ও সম্পত্তির বিলি-বণ্টনের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

মাস চারেক আগে প্রথমবার তাঁর নির্দেশে উইলের খসড়া করেন মিঃ মিত্র। তবে সেই খসড়া দিন দুয়েক পরে তিনি ছিঁড়ে ফেলেন। দ্বিতীয় উইলের খসড়া তৈরী হয় দিন পনেরো আগে। আগামী সোমবার ওই উইল রেজিস্ট্রী হবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। মারা যাবার আগের সন্ধ্যায় বিরাজমোহন ফোনে অধীর মিত্রকে ডেকে পাঠান। তখন ডাঃ সেন ওখানে ছিলেন। ডাঃ সেন চলে যাবার পর বিরাজমোহন জানতে চান, এখন কোন প্রভিশান আছে কিনা, যাতে উইল রেজিস্ট্রী না হলেও ভ্যালিড বলে গণ্য হবে? উত্তরে মিত্র বলেন, যদি কেউ নিজের হাতে লিখে সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করে তবে তা ভ্যালিড হবে।

এই কথা শোনার পরই বিরাজমোহন আগের উইলখানা আলমারি থেকে বার করে এনে বললেন, এটা আর রেজিস্ট্রী হবে না। আমি মত পাল্টেছি। তারপরই তিনি সেই উইলখানা ছিঁড়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দেন। এরপর মিনিট দশেকের মধ্যেই মিঃ মিত্র ওখান থেকে বিদায় নেন।

প্রণিমা কর

—বয়স পঁচিশ বছর। ভারী মিষ্টি চেহারা। মাত্র দিন দুয়েক আগে সোনারপুরে মা'র কাছে এসেছিল ছুটি কাটাতে। এই সময় কালীনাথের চিঠি ওখানে পৌঁছায়। ওই চিঠিতে জানা যায় বিরাজমোহন খুব অসুস্থ। অবশ্য এলগিন রোডের বাড়িতে প্রণিমা প্রথমে আসতে চায়নি। মা অনেক খোশামোদ করায় আসতে রাজী হয়েছিল। অবশ্য এই সঙ্গে একথাও জানতে পেরেছিল, বিরাজমোহন তার জনক। যদিও তার মা'র স্বামী ছিলেন অন্য একজন। এতদিন এ সমস্ত কথা জানতে না পারার কারণ হল, সে ছোটবেলা থেকে বহরমপুরে মাসীর বাড়িতে আছে। মা মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে দেখা করে আসতেন। এখন ওখানকার এক সেলাই স্কুলে চাকরী করে। এক হপ্তার ছুটি নিয়ে মার কাছে এসেছিল।

এতদিন পরে মা কেন যে নিজের কেলেঙ্কারীর কথা তাকে বললেন সে বুঝতে পারেনি। তবে নিজের প্রকৃত পরিচয় জানার পরই আত্মধিক্কারে নুয়ে পড়েছিল। এত খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি সে আগে কখনও হয়নি। তবু শেষ পর্যন্ত মনকে বুঝিয়ে বিরাজমোহনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নিজের জনককে দেখে প্রণিমার ভাল লাগেনি। এই সঙ্গে কিন্তু তার এ কথাও মনে হয়েছে, ওই ধনী, দাম্ভিক লোকটি যেন সুখী নয় - ভারী অসহায়।

ওঁর আত্মীয়-স্বজনের সামনেই উনি প্রণিমার সঙ্গে কথা

বলেন। বেশ স্বাভাবিক ছিলেন। কিন্তু মার নাম শোনার পরই বিরাজমোহন বিছানায় এলিয়ে পড়েন। তারপর নিজেকে সামলে নেবার পর, তাকে থেকে যেতে বলেন রাতটা। 'সকালে কথা বলবেন। অনিচ্ছার সঙ্গে প্রণিমাকে থেকে যেতে হয়। খাওয়া দাওয়ার পর বিরাজমোহন দু-চার কথা বলেন তাকে। তারপর নির্দিষ্ট ঘরে শুতে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই নয়নতারা এসে উপস্থিত হন। তিনি গায়ে পড়ে অপমান করতে আরম্ভ করেন। গোলমালের শব্দ পেয়ে পাশের ঘর থেকে ছুটে আসেন সুবীর বাবু।

এরপর নানা কথা ভাবতে ভাবতে প্রণিমা ঘুমিয়ে পড়ে। আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যায় ভোর রাত্রে। খোলা বারান্দার দিক থেকে একটা লোক ঘরের মধ্যে ঢোকে। আবছা অন্ধকারে তাকে চেনা যায়নি। সে অবশ্য ভেতর বাড়ির বারান্দার দিকের দরজা খুলে সরে পড়ে। প্রণিমা ভয় পেয়ে সুবীরকে ডাকে। দুজনের ধারনা হয় লোকটা চোর। চোরকে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়েই ওরা জানলার এধার থেকে বিরাজমোহনের মৃতদেহ দেখতে পায়। এই সময় কালীনাথও নীচে থেকে উপরে আসে।

সুবীর সোম

—মা'র মুখ থেকে সে জানতে পেরেছিল, বিরাজমোহন তার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কালীনাথের চিঠি পাবার পর—মার বিশেষ অনুরোধেই সে এসেছিল এ বাড়িতে। বিরাজ-মোহনের কথাবার্তা ও হাবভাব ভাল লাগেনি। উনি রাতটা থেকে যেতে বলেছিলেন। পরের দিন কি বিষয়ে যেন কথা বলবেন।

খাওয়া দাওয়ার পর সে যখন তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে বিশ্রাম নেবার আয়োজন করছে তখন পাশের ঘরে কথা কাটাকাটির শব্দ শুনে গিয়ে দেখে, নয়নতারা দেবী ধমকের সুরে প্রণিমা দেবীকে

কিছু বলছেন। তার উপস্থিতিতে ব্যাপারটা মিটে যায়। নয়নতারা দেবী চলে যাবার পর সে নিজের ঘরে চলে আসে। আবার ভোরের দিকে সে প্রণিমার আহ্বানে দরজা খোলে। প্রণিমাকে তখন অত্যন্ত নার্ভাস দেখাচ্ছিল। একজন লোক নাকি খোলা বারান্দার দিক থেকে প্রণিমার ঘরে ঢোকে এবং ভেতর বাড়ির দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। চোর ছাড়া আর কে হতে পারে, এই ধারনা নিয়ে লোকটাকে দুজনে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে। তখনই জানলার মধ্যে দিয়ে ওরা বিরাজমোহনের মেঝেতে পড়ে থাকা দেহটা দেখতে পায়। তিনি খুন হয়েছেন কি আত্মহত্যা করেছেন, এ সম্পর্কে তার কোন সুনির্দিষ্ট ধারনা নেই।

কালীনাথ ঘোষ

—আদি নিবাস বর্ধমানে। বছর পনেরো ধরে কলকাতাতে আছেন। আগে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের গোদাবরী অয়েল মিলে খাতা লিখতেন। বিরাজমোহনের কাছে কাজ করছেন গত দশ বছর ধরে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সমস্তই করতে হত। কাজেই কর্তার অনেক গোপন কাজ কারবারের সন্ধান তিনি রাখতেন। তবে এখন সে সব সম্পর্কে কিছু বলবেন না। কর্তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা তাঁর উচিত নয়। ঘিয়ে ভাজা চেহারা। দেখলেই মনে হয় চালাক চতুর।

কর্তার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি জেনে তিনি অবাক হননি। এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে আগেই আঁচ করেছিলেন। কর্তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এমন একজন নেই যাকে ভাল বলা চলে। সকলেই বাগাবার তালে ঘুরঘুর করছে। এদের মধ্যে যে কেউ স্বার্থের খাতিরে এই হৃদয় বিদারক কাজ করে থাকতে পারে। কালীনাথের চিঠি পেয়েই সকলে সেদিন বিরাজমোহনের কাছে এসেছিলেন, একথা তিনি জোর গলায় অস্বীকার করেছেন।

পরে হাতের লেখা মিলিয়ে দেখা গেছে চিঠিগুলি কালীনাথের লেখা নয়।

প্রমীলা কর

—সোনারপুরে থাকেন (পুলিশ ওখানে গিয়ে তাঁর এজাহার নিয়েছে) বয়স একান্ন। এককালে যে সুন্দরী ছিলেন এখনও তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। মাত্র একুশ বছরে বিধবা হন। নিম্ন বিত্ত পরিবারে সচরাচর যা হয়ে থাকে—অল্প কিছুদিন পরেই শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায় নিতে হল। বাপের বাড়ির অবস্থা আরো খারাপ ছিল। তাঁরা এই উটকো বোঝা ঘাড়ে নিতে বেশ অস্বস্তিবোধ করছিলেন। শেষে এমন দিন এল যখন অসহায় প্রমীলা পেটের দায়ে বাবু ধরার কাজে নেমে পড়তে বাধ্য হলেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে যখন ক্লান্ত তখনই ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল বিরাজমোহনের সঙ্গে। এরপরের পনেরোটা বছর বিরাজমোহন তাঁর কাছে যাওয়া আসা করেছেন। প্রণিমার জন্ম হয়েছে সে একটু বড় হলেই, ঘৃণ্য পরিবেশ থেকে তাকে সরিয়ে বোর্ডিং'এ রাখা হয়েছে। সোনারপুরে একটা একতলা বাড়ি উনি তৈরী করিয়ে দিয়েছেন প্রমীলাকে। পনেরো বছর পরে কেন জানা যায় না বিরাজমোহন নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। সম্পর্কে ছেদ পড়লেও, আর্থিক দিক থেকে প্রমীলাকে অসুবিধায় পড়তে হয়নি। প্রতি মাসেই টাকা পাঠিয়ে গেছেন বিরাজমোহন। লোক মারফত নয় ডাকযোগে।

প্রণিমার কাছে এতদিন সমস্ত কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। লেখাপড়া শেষ করার পর সে তাঁর কাছে থাকতো না। তাকে রাখা হয়েছিল বহরমপুরে তার মাসীর বাড়ি। ওখানে সে সেলাই স্কুলে কাজ করে। কাজেই ব্যাপারটা জানাজানি হতে পারেনি। কয়েকদিন আগে কালীনাথ ঘোষ নামে একজনের কাছ থেকে প্রমীলা চিঠি পেলেন। উনি বিরাজমোহনের

কর্মচারী। কালীনাথ লিখেছেন, কর্তা অসুস্থ। এবং অমুক তারিখে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে যেতে বলেছেন। প্রমীলা ভাবনায় পড়ে গেলেন। ওখানে হঠাৎ যাওয়া যে ঠিক হবেনা, এটা তিনি বুঝলেন। চিন্তা ভাবনার পর শেষে স্থির করলেন মেয়েকে পাঠাবেন ওখানে। লজ্জার মাথা খেয়ে বলতে হল সব কথা মেয়েকে। নিজের জন্ম ইতিহাস শুনে প্রণিমা গুম হয়ে গেল। বহু কষ্টে প্রমীলা মেয়েকে রাজী করালেন বাপের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর ওখানে কিভাবে কি ঘটেছে তার কিছুই জানেন না।

বাসব পড়া শেষ করল।

স্টেটমেন্টের কপিগুলো মুড়তে মুড়তে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে রইল সামনের দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালের পেলগ্রীন রং'এর আস্তারণের উপর দিয়ে একটা টিকটিকি মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাসবের কপালে ভাঁজ পড়তে আরম্ভ করল। মিনিট পাঁচেক কি যেন ভাবল। তারপর আড়মোড়া ভেঙ্গে নিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

ফিরে এল আবার ড্রইং রুমে।

সাগ্রহে সামন্ত প্রশ্ন করলেন, কিছু আঁচ করতে পারলেন?

বাসব বসতে বসতে বলল, কিছু পারিনি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

কি রকম?

—বিরাজমোহনের মৃতদেহ প্রথমে কে দেখেছিল?

—আপনাকে তো আগেই বলেছি, প্রণিমা আর সুবীর।

—সে কথা আমি মনে রেখেছি। কিন্তু কথা ঠিক নয় মিঃ সামন্ত। ওদের দুজনের আগেই একজন জানতে পেরেছিল বিরাজমোহন মারা গেছেন।

সামন্ত মৃদু হেসে বললেন, স্বাভাবিক। হত্যাকারীর সবচেয়ে আগে জানবার কথা বিরাজমোহন মারা গেছেন।

হত্যাকারী নয়। আরো একজন।

—কে সে ?

—যাকে আপনারা প্রায় হত্যাকারী ভেবে নিয়েছেন।

অবাক দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকালেন সামন্ত।

—কার কথা বলছেন ?

বাসব পাইপে মিক্সচার ঠাসতে ঠাসতে বলল, ভোর রাতে যে লোকটা প্রণিমার ঘরে ঢুকেছিল। আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই সে এক নম্বর সাসপেক্ট ?

—না হবার তো কোন কারণ নেই। তার অ্যাক্টিভিটি ওয়াচ করলে ব্যাপারটা গম্ভীর আকার নেয় না কি ?

—আপনার কথা অস্বীকার করিনা। তবু একটু খুঁটিয়ে যদি চিন্তা করেন, বুঝতে অসুবিধা হবে না, সে আর যেই হোক, হত্যাকারী নয়। ব্যাপারটা এবার সহজ করে আনা যাক। পোষ্টমর্টমের রিপোর্টের কথা স্মরণ করুন। আপনার মুখ থেকেই শুনলাম রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিরাজমোহন মারা গেছেন রাত একটার মধ্যে, নয় কি ?

—ঠিক তাই।

—অথচ আমরা এই আগন্তুকের সন্ধান পাচ্ছি ভোর চারটের পর।

—তা বটে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, রাত এগারটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত আগন্তুক ওই ঘরে মড়া আগলে বসেছিল এটা নিশ্চয় ধরে নেওয়া যায় না।

চিন্তিত গলায় সামন্ত বললেন, আপনার যুক্তিতে জোর আছে। তবে ওই লোকটার অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে।

—অবশ্যই আছে। উদ্দেশ্যটা এই মুহূর্তে জানা যাচ্ছে না। তবে কি ভাবে সে বিরাজমোহনের ঘরে ঢুকেছিল তার একটা থিওরি খাড়া করা যায়।

—যেমন—

—আপনি বলেছেন, বিরাজমোহনের ঘরের খোলা বারান্দার নীচে একটা মই পাওয়া গেছে। ওই মই বেয়েই লোকটা ভোর রাত্রের দিকে উপরে উঠেছিল। ঘরে ঢুকেই সে দেখতে পায় গৃহকর্তা মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছেন। স্বাভাবিক কারণেই সে ভয় পায়। ওখানে থাকা আর সমীচিন মনে করে না। বারান্দায় এসে আরেক ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয় তাকে।

লক্ষ্য করে, মই দেওয়ালে ঠেস দেওয়া অবস্থায় নেই। হড়কে পড়ে গেছে ঘাস জমির উপর। ওধারের দরজা দিয়ে যে সরে পড়বে তার উপায়ও নেই। অভ্যাস মতো বিরাজমোহন দরজায় তালা দিয়ে রেখেছিলেন। চাবি খুঁজে নেওয়ার ঝুঁকি সে আর নিতে চায়নি। কারণ হয়তো চাবি পাওয়াও যাবেনা, অথচ সময় নষ্ট হবে অনেক। তখন তার সামনে একটা পথই খোলা ছিল। পাশের খোলা বারান্দায় লাফিয়ে পড়া, তারপর ওই ঘর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। সে সেই কাজই করেছিল।

—আপনার থিওরি মোটামুটি বাস্তব ঘেঁসা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এরপরও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে মি. ব্যানার্জ্জী।

—কোন প্রশ্ন ?

—যে লোক ঘরে ঢোকার দরজায় প্রতিদিন ছিটকিনি লাগিয়েই শান্তি পেতনা, তালা লাগাতো। সে কি খোলা বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা রেখে দেবে ? ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছেনা।

চিন্তিত গলায় বাসব বলল, ভাল প্রশ্ন। আমিও আপনার সঙ্গে একমত। বিরাজমোহনের যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে এমন আহাম্মুক তিনি ছিলেন বলে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।

—তাহলে লোকটা ওই ঘরে ঢুকেছিল কি ভাবে ?

—আমার মনে হয়, ওই দরজাটা মোটেই খোলা হত না। ছিটকিনি দেওয়াই থাকত। বিরাজমোহন ওধারে নজর দেওয়ার

প্রয়োজন মনে করতেন না। ভাল কথা, ওই দরজার সামনে পর্দা দেওয়া আছে কি ?

—আছে।

—পর্দা দরজার ফ্রেমে আটকানো না, পেলমেটে সেট করা ?

—পেলমেটের সঙ্গে আটকানো।

মৃদু হেসে বাসব বলল, তবে তো হিসাব মিলেই গেল। যে লোক ওই ঘরে ঢুকবে ঠিক করেছিল, সে কোন অসতর্ক মুহূর্তে খুলে রেখেছিল দরজাটা। সামনে পেলমেটের সঙ্গে যুক্ত পর্দা থাকায় কারচুপি ধরা পড়েনি।

—সে তাহলে ওই বাড়িরই একজন ?

—নিশ্চয়।

সামন্ত দ্রুত গলায় বললেন, এবার তাহলে আমাদের ভেবে দেখা দরকার সে কে হতে পারে।

—তাকে চিনে ওঠা কঠিন হবেনা।

—কি রকম ?

—প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে এই ধরণের কাজ কার পক্ষে করা সম্ভব, আমি শারীরিক পটুতা সম্পর্কে বলতে চাইছি। যেমন ধরুণ, সে এমন একজন লোক যার বয়স বেশী নয়। চটপটে। বয়স্ক লোকেদের পক্ষে মই বেয়ে এতটা ওঠা বা এ বারান্দা থেকে ও বারান্দায় লাফিয়ে পড়া নিশ্চয় সম্ভব নয় ?

—তা ঠিক।

—বয়স কম হলেও সুবীর সোমকে কিন্তু বাদ দিতে হবে। আগন্তুকের আবির্ভাবে প্রণিমা ডেকে এনেছিল তাঁকে। কাজেই তিনি আগন্তুক হতে পারেন না।

—ওই একই কারণে প্রণিমাও বাদ পড়ে গেল।

—নয়নতারাদেবীও বাদ পড়লেন। কোন বয়স্কা বাঙ্গালী মহিলার পক্ষে এ একেবারে অসম্ভব কাজ।

—বীরাজমোহনকেও বাদ দিতে হবে। বয়স ছাড়াও মোটা-সোটা লোক।

—কালীনাথকেও হিসাবে আনা যাচ্ছে না। বয়স্ক লোক।

ভারীগলায় সামন্ত বললেন, এরপর একজনই থাকছে, প্রেম-কিশোর করগুপ্ত। বয়স কম। একহারা চেহারা।

—আমারও তাই মনে হয়। সবদিক থেকে প্রেমকিশোরকেই উপযুক্ত লোক বলে মনে হয়। বাজিয়ে দেখতে হবে।

কথা শেষ করেই বাসব শৈবালের দিকে মুখ ফেরাল।

—ডাক্তার, আরেকবার চা খাওয়া চলতে পারে। বাহাদুরকে একবার খোঁচাওনা গিয়ে। আপনি কি বলেন মিঃ সামন্ত?

মৃদু হেসে সামন্ত বললেন, মন্দ কি?

শৈবাল উঠে গেল।

বাসব আবার পুরানো কথার জের টানল, প্রেমকিশোর এখন আমাদের হাতের পাঁচ। কিন্তু আরো এগিয়ে যাবার জন্য গুটিকয়েক প্রশ্নের উত্তর এখন আমাদের দরকার।

—যথা—

—তারমধ্যে প্রধান হল, সকলেই ঘরের দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে শোয়। অথচ বিরাজমোহন তালা লাগাতেন। এই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের কারণ কি?

—হয়তো—

—থামলেন কেন?

—হয়তো কোন মূল্যবান জিনিষকে রক্ষা করার জন্য তিনি এরকম করতেন।

—এটাই স্বাভাবিক। মূল্যবান জিনিষটা এখন খোওয়া গেছে।

—খোওয়া গেছে।

—সবই আমাদের অনুমান। হয়তো ওটাই হত্যার মোটিভ। পটাসিয়াম সায়নাইডের সাহায্যে বিরাজমোহনকে সরিয়ে দিয়ে হত্যা

কারী মূল্যবান জিনিষটা বাগিয়েছে। এখন আমাদের জানতে হবে—

ধাসব কথা শেষ না করেই থামল।

তারপর উত্তেজিত গলায় বলল, কালো টাকা। আপনি বলছিলেন না, বাঁকা পথ দিয়ে বিরাজমোহনের রোজগারের ব্যবস্থা ছিল?

—ছিলই তো। একথা পুলিশ যে জানতো না তা নয়। লোকটা অত্যন্ত চতুর ছিল। প্রমাণের অভাবেই তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

—আর কোন সন্দেহ নেই। উনি নিজেও শোবার ঘরেই কালো টাকা রাখতেন। নিশ্চয় কেউ একথা জানতে পেরেছিল। লোভ সময় সময় মানুষকে উন্মাদ করে তোলে জানেন তো?

চা এসে পড়লো।

চা' এর কাপ তুলে নিয়ে চিন্তিত গলায় সামন্ত বললেন, আপনার অনুমান ঠিক পথ ধরেই এগিয়েছে।। কালো টাকাই। নয়তো এত সতর্কতার কোন মানে হয়না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হত্যাকারী কে? প্রণিমা করের ঘরের মধ্যে দিয়ে লোকটা পালাল, আমাদের অনুমানে সে প্রেমকিশোর। তাকে হিসাব মত হত্যাকারী প্রতিপন্ন করা যাচ্ছে না। তাহলে কি বুঝতে হবে, হত্যাকারী কোনক্রমে বুঝতে পেরেছিল খোলা বারান্দার দিকের দরজা খোলা আছে? সেও কি ওই পথ দিয়েই বিরাজমোহনের ঘরে প্রবেশ করেছিল?

—হয়তো। আবার এমনও হতে পারে—ওকথা এখন থাক। বিরাজমোহনের কালো টাকা সম্পর্কে আপনি ওদের প্রশ্ন করেছিলেন?

—করেছিলাম।

—কে কি বলল?

এরপর সামন্ত যা বললেন তার সারাংশ নিম্নরূপ—

ধীরাজমোহন

—দাদা বাঁকা পথ দিয়ে টাকা রোজগার করতেন জানা

ছিল তাঁর। এই সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি কখনও দুজনের মধ্যে। তবে একই বাড়িতে থাকার দরুন ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হতনা। টাকাটা দাদা কোথায় রাখতেন তা অবশ্য তাঁর জানা নেই।

নয়নতারা

—দাদার একটা ব্যবসা আছে। তার দৌলতেই যে উনি বড়লোক একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। কানাঘুসো শুনেও ছিলেন, দাদা স্মাগলিং বা ওই ধরনের কিছু করেন। ওই সমস্ত টাকা কোথায় রাখতেন তিনি জানেন না।

প্রেমকিশোর

—কলকাতার বোধহয় অর্ধেক লোক জানে উনি স্মাগলার। পুলিশের না জানার কথা নয়। কেন যে গ্রেপ্তার হননি এটাই আশ্চর্য্য। সে বাড়ির বাসিন্দা নয়, কাজেই তার জানার কথা নয় উনি কালো টাকা কোথায় রাখতেন।

রজত সেন

—বিরাজমোহনের আসল কারবার যে আইনসম্মত নয়, এটা সেন জানতেন। উনি কথারচ্ছলে বলেছিলেন কয়েকবার। বলে বাহাদুরী নিতেন। তবে কালো টাকা কোথায় রাখতেন একথা কাউকে বলার লোক উনি ছিলেন না।

কালীনাথ

—হিসাবের বাইরে অনেক টাকা কর্তাকে সে লেনদেন করতে দেখেছে। নানা জাতের লোক এসে টাকা দিয়ে যেত। কেন দিত তা অবশ্য সে জানে না। এই সঙ্গে এও জানে না এই সমস্ত টাকা কর্তা কোথায় লুকিয়ে রাখতেন।

প্রণিমা

—বিরাজমোহনের আয়ের উৎস কি ছিল তা জানা অনেক দূরের কথা—চব্বিশ ঘণ্টা আগেও ভদ্রলোক দেখতে কেমন তাও

তার জানা ছিল না। কাজেই উনি টাকা-পয়সা কোথায় রাখতেন তার জানার কথা নয়।

সুবীর

—মারা যাওয়ার আগের বিকেলে সে প্রথম বিরাজমোহনকে দেখে। ওঁর গুপ্তধনাগার সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমনকি তার এও জানা ছিল না, উনি কোন পেষায় যুক্ত—অর্থাগম হয় বাঁকা না, সোজা পথ দিয়ে।

বাসব বলল, দেখা যাচ্ছে কেউ কিছু জানে না। আমার কিন্তু বিশ্বাস এদের কেউ একজন কিছু না কিছু জানে। এছাড়া আমি জোর গলায় বলতে পারি ঐ কালো টাকাই হল খুনের মোটিভ।

—আমারও তাই ধারণা।

সামন্ত উঠে দাঁড়ালেন।

—এবার তাহলে যাওয়া যেতে পারে।

—দুর্ঘটনাস্থলে ?

—হ্যাঁ।

—চলুন—

‘বিরাজ ভবনে’ একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

বছর আটেক আগে এই বাড়িখানা বিরাজমোহন এক পড়তি পরিবারের কাছ থেকে কিনে ছিলেন। পরে কিছু অদল বদল করে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন আজকের অবস্থায়। সৌখিন লোক ছিলেন তিনি। প্রথমে একাই এখানে এসে উঠেছিলেন। পরে ছোট ভাই ধীরাজমোহনকে থাকার অনুমতি দেন।

সেই বিরাজমোহন আজ নেই।

‘বিরাজ ভবন’ তাই থমথম করছে।

বাড়িতে এখন অবশ্য ধীরাজমোহন একা নেই। খুনের দিন যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই রয়েছেন পুলিশের অনুরোধে।

এক্ষেত্রে অবশ্য অনুরোধের আরেক অর্থ হল আদেশ। সকলেই কিছুটা অস্বস্তির শিকার, কিন্তু করার কিছুই নেই। প্রমীলা কর গতকাল এসে মেয়ের সঙ্গে দেখা করে গেছেন।

কালীনাথ বিরাজমোহনের অফিস ঘরে এসে ঢুকলো। সুদৃশ্য সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের উপর পুরু কাচ পাতা। কয়েকদিনের উপেক্ষায় কাচের উপর ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। ক্রেডলের উপর থেকে রিসিভার তুলে নিল কালীনাথ। একটা নম্বর ডায়েল করল।

ওধারে রিং হচ্ছে।

কেউ সাড়া দেবার আগেই কিন্তু বাধার মুখোমুখি হতে হল। ধীরাজমোহন ঘরে প্রবেশ করলেন। বিরক্তিতেই বোধহয় দুই ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে। তাড়াতাড়ি কালীনাথ রিসিভার নামিয়ে রাখল।

—আপনি ফোন করছিলেন ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

ধীরাজমোহনের গলা এবার তীক্ষ্ণ।

—এ সমস্ত কি হচ্ছে ?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না—

—এ বাড়ির কর্তা এখন আমি। বাজে খরচ একেবারেই বরদাস্ত করব না। ভবিষ্যতে ফোন করবার ইচ্ছে হলে আমার অনুমতি নেবেন।

কালীনাথ হকচকিয়ে গিয়েছিল।

অবশ্য নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে বলল, আজ্ঞে, আমি জানতাম না। এখন যদি অনুমতি করেন, তবে একবার ফোন করি।

—না।

—যা চার্জ হবে আমি দিয়ে দেব।

ধীরাজমোহন চীৎকার করে উঠলেন।

—এত বড় সাহস! কথাটা তুমি আমায় বলতে পারলে ? মাইনে করা কর্মচারী হয়ে আমায় টাকা দেখাচ্ছ!

—হিসাবে একটু ভুল হচ্ছে কাকা—

ধীরাজমোহন ফিরে দেখলেন দরজার কাছে প্রেমকিশোর দাঁড়িয়ে।

—ওঁকে চোখ রাঙ্গিও না। প্রেমকিশোর নিজের কথা শেষ করল, উনি তোমার মাইনে করা কর্মচারী কবে হলেন বলতো ?

—প্রেম, প্রত্যেক ব্যাপারের একটা সীমা আছে। আমি চাইনা তুমি সমস্ত কিছুর মধ্যে মাথা গলাও।

—তুমি না চাইলে আমি নাচার। যা সত্যি তা আমি বলবই। তোমার যদি ভাল না লাগে আমার কিছু যায় আসেনা।

—বেশী স্মার্ট হবার চেষ্টা করোনা। খুবতো বুলি কপচাচ্ছো—পুলিশি ঝামেলা না থাকলে, ঘাড় ধরে তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতাম এখনও বুঝতে পারনি ?

প্রেমকিশোর ঝলসে উঠল।

—কি বললে। ঘাড় ধরে—তুমি কি চাও তোমার সম্মানের কবর আমি এখানেই খুঁড়ে ফেলি। কেউ বাঁচাবে না তোমাকে। বাড়ি—বাড়ি করে এত হম্বিতম্বি করছো কেন ? প্রমাণ করতে পারবে এই বাড়িখানা জ্যাঠামশাই তোমাকে দিয়ে গেছেন ?

ধীরাজমোহন কিছু বলার আগেই কালীনাথ বলল, আপনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন প্রেম বাবু। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন।

প্রেমকিশোর বলল, আজেবাজে কথা শুনলে মাথার ঠিক থাকেনা। ভাল কথা, আপনি কি স্থির করলেন ?

—কিসের ?

—কাজকর্মের কথা বলছি। এ বাড়ির অন্নতো আপনার উঠল।

একটু ইতঃস্তত করে কালীনাথ বলল, একটা কাজ জুটে যাবেই। তাছাড়া এখনও বিশেষ অসুবিধা হবেনা। এককালীন অনেক টাকা পেয়ে যাচ্ছি।

—বলেন কি। কে দিচ্ছে ?

ধীরাজমোহন গম্ভীর মুখে কিছুটা এগিয়ে গেছেন তখন। কালী-নাথ উত্তর দিতে গিয়েও থামল—কারণ, দেখা গেল এই বাড়ির এ্যাটর্ণী অধীর মিত্র মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছেন।

মোটামুটি লম্বা। স্বাস্থ্যবান লোক। বয়স পঞ্চাশের উপরে হবেনা। ভারী ফ্রেমের চশমা তাঁকে আভিজাত্যময় করে তুলেছে। তিনি ধীরাজমোহনের সামনে গিয়ে থামলেন। কালীনাথ আর প্রেমকিশোরও কয়েক পা এগিয়ে গেছে। হঠাৎ এ্যাটর্ণীর আগমণে আগ্রহ সঞ্চার মনে হতেই পারে।

পর্যায়ক্রমে তিনজনের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মিত্র বললেন, আপনার চিঠি পেয়েই চলে এলাম কালীবাবু।

আকাশ থেকে পড়ল কালীনাথ।

—চিঠি !!!

—ব্যাপারটা যখন জানতেন তখন আগে বলেননি কেন ?

—কোন ব্যাপার ? কি সমস্ত বলছেন ? বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

অধীর মিত্র পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন।

—এই চিঠিখানা আপনি লেখেননি ?

সকলে ঝুঁকে পড়ল চিঠিখানার উপর।

প্রেমকিশোর চেঁচিয়ে পড়ল—

মান্যবর মিত্র মহাশয়,

সেদিন সন্ধ্যায় আপনি চলে যাবার পর কর্তা উইল তৈরী করেছিলেন। তাঁর নিজের হাতে লেখা উইল বর্তমানে তাঁর শোবার ঘরের কোথাও রয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত ভাবে জরুরী, আপনাকে তাই জানালাম।

নমস্কার

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

কালীনাথ প্রায় চীৎকার করে উঠল।

—এ চিঠি আমি লিখিনি। হাতের লেখা আমার নয়।

বিস্মিত মিত্র বললেন, আপনার নয়। তবে—

—কেউ আমাকে ডোবাবার তালে আছে। ভগবান জানেন, আমি তার কি উপকার করেছি। আগেও কয়েকখানা চিঠি আমার নামে লেখা হয়েছে। বিশ্বাস করুন স্যার একাজ আমার নয়।

—কিন্তু কার পক্ষে এই চিঠি লেখা সম্ভব ?

—আমি জানি না স্যার। কিন্তু যে লিখেছে, আপনি দেখবেন তার কিছুতেই ভাল হবে না।

প্রেমকিশোর বলল, চিঠিখানা কে লিখেছে তা নিয়ে এখন মাথা না ঘামিয়ে বরং ও'র ঘরখানা একবার খুঁজে দেখলে হয় না।

—উইলখানা পাওয়া যেতে পারে বলছেন ?

গম্ভীর গলায় ধীরাজমোহন বললেন, ঘরখানা এখন পুলিশের হাতে। তাদের অনুমতি ছাড়া কিছু করা যাবে না। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি না দাদা এরকম কিছু করেছেন।

মিত্র বললেন, ব্যাপারটা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেদিন উনি আমায় প্রশ্ন করেছিলেন, নিজের হাতে উইল লিখলে ভ্যালিড হবে কিনা। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, নিশ্চয় হবে।

—এতেই আপনার ধারণা হচ্ছে উনি উইল করেছিলেন ?

—হ্যাঁ। নইলে পরের দিন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকা সত্বেও, তাড়াহুড়ো করে আমায় আগের সন্ধ্যায় ডেকে পাঠালেন কেন ? যাহোক, থানা থেকে এখন কারুর আসবার কথা আছে কি ?

ভারী গলায় ধীরাজমোহন বললেন, কেসটা এখন লালবাজারের হাতে। ওখানকার একজন কর্তা ব্যক্তির তো আসবার কথা আছে। তবে কখন আসবেন আমি জানি না।

ওদিকে—

—মা ভীষণ ভাবছেন। পুলিশ আর কতদিন আটকে রাখবে কে জানে

প্রণিমার কথা শুনে সুবীর মাথা নাড়ল।

বলল চিন্তিত গলায়, আমারও তো ওই অবস্থা। চাকরীর ব্যাপারটা তো আছেই, তাছাড়া মাকে বলে এসেছিলাম, দিন দুয়েকের মধ্যেই ফিরবো। কি ঝামেলা বলুন তো?

ওরা দোতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

—এ বাড়ির লোকজনরা কত খারাপ দেখেছেন। বিশেষ করে ওই নয়নতারা দেবী—আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

—উনি তো আপনার পিসিমা হন।

মৃদু হেসে প্রণিমা বলল, অমন পিসিমা মাথায় থাকুন। যে কেউ বলবে, এ বাড়ির লোকেরা ভাল নয়।

—এ বাড়ির লোকজন তোমার পাকা ধানে মই দিল কবে?

দুজনে চমকে মুখ ফেরাল।

অদূরে দাঁড়িয়ে নয়নতারা। কখন উনি নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছেন দুজনের কেউ বুঝতে পারেনি। একেই বোধহয় বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। ওদের কথাবার্তা যে উনি শুনেছেন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে।

নয়নতারা কয়েক পা এগিয়ে এলেন।

বললেন তীক্ষ্ণ গলায়, এসেছিলে কেন শুনি? কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

প্রণিমার মনের মধ্যেটা জ্বলে উঠল। ইচ্ছে করল এখুনি ফেটে পড়ে। অবশ্য অসীম বলে সংযত করে নিল নিজেকে। তবে চুপ করে থাকাটা যে পিছিয়ে পড়া মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হবে এটা স্থির করে নিতে অসুবিধা হলনা।

বলল থেমে থেমে, কি চাইছেন বলুন তো? পিছনে লেগে রয়েছেন ফেউ'এর মত। আমার সহ্যের একটা সীমা আছে।

—কি বললে, ফেউ?

—হ্যাঁ। তাই বললাম।

—এতবড় সাহস তোমার? ছোট মুখে বড় কথা। তাও যদি কিছু আমার জানতে বাকী থাকতো।

—আপনি কি জানেন?

টেনে টেনে নয়নতারা বললেন, কি জানি না তাই বল? তোমার মায়ের কেচ্ছার পুরোপুরিটাই আমার জানা আছে। শুনবে তো বল? পুরানো কাসুন্দি কিছু ঘাঁটি।

সুবীর আর চুপ করে থাকতে পারল না।

ভারী গলায় বলল, নয়নতারা দেবী, কি দরকার এ সমস্ত কথা বলার। প্রথম থেকেই উনি তো আপনার সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখান নি।

—খুব দরদ দেখছি। দিন কয়েক আগে তো আলাপও ছিল না। এরি মধ্যে এত কাণ্ড?

—আপনি ওভাবে বলবেন না। মানে……

প্রণিমা সুবীরের একটা হাত চেপে ধরল।

--আর কথা বাড়াবেন না। ওধারে চলুন।

নয়নতারা এবার গলা ছাড়লেন,, ঘেন্নায় মরি। অ্যাঁ—মেজদা মারা যেতে না যেতেই এবাড়ির এই হাল!

উনি আর দাঁড়ালেন না।

সিঁড়ির মুখে পোঁছাতেই দেখলেন নীচেকার দল উপরে উঠে আসছে।

প্রেমকিশোর ছিল সবার আগে।

বলল, তোমার মিষ্টি গলা নীচে থেকে শুনতে পেলাম যেন। ব্যাপার গুরুতর কিছু নয়তো?

গম্ভীর গলায় নয়নতারা বললেন, প্রেম, ঠাট্টা তামাসা আমার সব সময় ভাল লাগেনা। ভুলে যেওনা, আমি তোমার গুরুজন।

—এই দেখ, তুমি রেগে গেলে। তুমি আমার পিসি, তোমার সঙ্গে কি তামাসা করতে পারি? কি হয়েছিল বলতো?

—হতে আর কিছু বাকী নেই।

—মানে—?

খেঁকিয়ে উঠলেন নয়নতারা, বললুম তো হতে আর কিছু বাকী নেই। রাসলীলা আরম্ভ হয়ে গেছে, বুঝেছো?

প্রেমকিশোর কি বলবে ভেবে পেলনা।

বাকী তিনজনও অবাক।

এই সময় দুজোড়া জুতোর শব্দ কানে এসে পৌঁছাল। পুলিশ এসে পড়েছে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হলনা কারুর। অজানা কারণেই সকলের মধ্যে একটা তটস্থ ভাব দেখা দিল।

শৈবাল আসেনি।

পুরন্দর সামন্ত বাসবকে সঙ্গে নিয়ে উপরে উঠে এলেন।

প্রথমে বাসবের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেবার সূত্রে বললেন, ইনি যে অপরাধ-তদন্তের ক্ষেত্রে একজন বিখ্যাত মানুষ একথা যদি আপনাদের অজানা থেকে থাকে, তবে জেনে রাখুন। আমাদের সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমার বন্ধু হিসাবেই এখন এখানে এসেছেন।

বাসব মৃদু হেসে বলল, বরাবরই লক্ষ্য করেছি, মিঃ সামন্ত আমার সম্পর্কে একটু বাড়িয়েই বলেন। যাহোক, বিরাজবাবু হত্যাকাণ্ডর বিবরণ শুনে কিছুটা আগ্রহ জেগেছে। চলে এলাম। ব্যাপারটা একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে চাই আর কি?

অধীর মিত্র বললেন, সুখের কথা আপনি এসেছেন। আমি আমার মৃত মক্কেলের কথা স্মরণ রেখে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি, পুলিশ এবং আপনার যৌথ চেষ্টায় এবার হত্যাকারী ধরা পড়বে।

থামলেন মিত্র।

আবার বললেন, আমার পরিচয়টা আপনাকে দিয়ে রাখি, অধীর মিত্র—বিরাজবাবুর আইন ও সম্পত্তি ঘটিত বিষয়গুলি আমিই দেখাশুনা করতাম।

মৃদু গলায় বাসব বলল, আপনার কথা শুনে খুসী হলাম। আশা করছি আপনার মত বাকীরাও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে রাখবেন।

কেউ কিছু বললেন না।

এই বেসরকারী ব্যক্তিটির আগমণে অনেকেই বোধহয় খুসী নন। অবশ্য এই ধরনের মনস্তত্বের মুখোমুখি বাসব বহুবার হয়েছে। সে সামন্তর দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল।

সামন্ত কাঁধ নাচালেন।

বললেন সহজ গলায়, মিঃ ব্যানার্জ্জী, আমরা এবার বিরাজ-মোহনের ঘরে যেতে পারি –

—নিশ্চয়।

কয়েক পা এগিয়ে সামন্ত থামলেন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা কেউ এখন বাড়ি থেকে বেরুবেন না। কিছু কথা আছে।

মিঃ মিত্র আপনিও কিছুক্ষণ থাকুন।

বিরাজমোহনের ঘর শীল করা ছিল।

শীল ভাঙ্গতে হল। বলাবাহুল্য একজন কনষ্টেবল এই ঘরের সামনে সর্বক্ষণের জন্য পাহারায় নিযুক্ত আছে। ঘরের মধ্যেকার বদ্ধ হাওয়া পরিবেশকে ভ্যাপসা গন্ধে ভরিয়ে তুলেছে। তাড়াতাড়ি জানলাগুলো খুলে দেওয়া হল।

ঘরে ঢোকার পর বাসব তীক্ষ্ণ চোখে চারিধারের তদন্ত আরম্ভ করে দিল। কোন অসঙ্গতি চোখে পড়ল না। সেকেলে কায়দায় সাজানো একজন ধনী ব্যক্তির শোবার ঘর যেমন হওয়া স্বাভাবিক, ঠিক তাই। আসবাবের বাহুল্যতা ঘরে নেই বলেই বোধহয় কিছুটা ছিমছাম।

সামন্ত ছাড়া আর কেউ ঘরে ঢোকেনি।

সকলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন নিশ্চুপ ভাবে।

বাসব মুখ ফেরাল। সরে এল সামন্তর দিকে।

—এমন কোন চাকর ছিল কি, যে শুধু বিরাজমোহনের কাজ করতো?

সামন্ত বললেন, হ্যাঁ। খাস চাকর বলতে যা বোঝায় এমন একজন চাকর আছে। কেন বলুন তো?

—লোকটার সঙ্গে কথা বলতাম।

—ডেকে দিচ্ছি।

সামন্ত বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে লম্বা গড়নের একজন লোক ঘরে প্রবেশ করল। পরনে খাটো ধুতি। পোড় খাওয়া চেহারা। বয়স আন্দাজ করা সম্ভব নয়। এখন বেশ ভীত দেখাচ্ছে ওকে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওকে দেখতে লাগল। তারপর প্রশ্ন করল, তোমার নাম কি?

—আজ্ঞে শ্রীনাথ।

—বিরাজবাবুর সুখ সুবিধার উপর নজর রাখতে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—কতদিন আছো এখানে?

শ্রীনাথ কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে।

বলল, পাঁচ বছরের কিছু বেশী হল।

—বিরাজবাবুর জন্য কি কি কাজ তোমায় করতে হত?

—আজ্ঞে, সব কাজই। নাওয়া ধোওয়ার ব্যবস্থা করা, ঘর গোছানো—

—আর বলতে হবে না। বুঝেছি। আচ্ছা, এবার দেখে শুনে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো।

শ্রীনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

বাসব ঘন ঘন পাইপে কয়েকবার টান দেবার পর বলল, এখন এই ঘরে যেখানে যা ছিল ঠিক তাই আছে না, কিছু এধার ওধার হয়েছে?

দৃষ্টি পিছলে গেল শ্রীনাথের এধার থেকে ওধার। এগিয়ে এবং পেছিয়ে কি সমস্ত দেখে নিল। শেষে তার দৃষ্টিতে সন্তোষের ছায়া পড়ল।

—আজ্ঞে, সব ঠিকই আছে।

—ঠিক বলছো তো।

শ্রীনাথ ঘাড় চুলকাতে লাগল।

—আজ্ঞে, আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

—ছোটখাটও কিছু হারায়নি? তুমি হয়তো ছোটখাট জিনিষ-গুলোর দিকে নজর দাওনি। আচ্ছা, ওই টেবিলটা থেকেই আরম্ভ করা যাক। ওর উপর তো অনেক কিছুই রয়েছে। দেখতো ভাল করে।

ষ্টিল আলমারির ডান পাশে রয়েছে টেবিল। সাইজে বেশী বড় নয়। গোটা কয়েক ওষুধের শিশি, পেপারওয়েট চাপা দেওয়া কাগজ। প্রেশকিপসান বোধহয়। সেভিং সেট, থার্মাল, এই ধরনের আরো কিছু টুকিটাকি জিনিষ রয়েছে। শ্রীনাথ এগিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

বলল শেষে, ওষুধ খাবার গেলাসটা নেই বাবু।

—শুধু গেলাস—

—আর সব ঠিক আছে।

—কত বড় গেলাস?

—ছোটমত। প্লাষ্টিকের।

—ঠিক আছে। এবার তুমি যাও।

শ্রীনাথ চলে যাবার পর বাসব ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট। একটা গেলাস পাওয়া যাচ্ছে না! এই গেলাসটা হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন রহস্য আছে না, নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার? ভেবে দেখার বিষয় সন্দেহ নেই।

পাইপ ধরাল বাসব।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে গেল খাটের কাছে। বালিশ ইত্যাদি নেড়ে চেড়ে দেখল। কাজে লাগে এমন কিছুই পাওয়া গেল না। খাটের সঙ্গে লাগোয়া টিপয়ের উপর পানের ডিবেটা খোলা অবস্থায় রয়েছে। বাসব দেখল সাজা অবস্থায় এখনও তিন খিলি পান রয়েছে। অবশ্য শুকিয়ে গেছে।

মেঝেতে কয়ারের কার্পেট পাতা।

খাটের তলাটাও দেখা দরকার। বাসব হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে পড়ল। খাটের তলায় আলো প্রবেশ করার সুযোগ কম। ছায়া ছায়া ভাব। ভাল করে তাকাতেই দেখতে পেল, মাঝামাঝি জায়গায় সাদামত কি একটা পড়ে রয়েছে। জিনিষটা যে কি এখান থেকে ঠাহর করা গেলনা।

আর কোন উপায় না থাকায় বাসব মাথা বাঁচিয়ে খাটের তলায় ঢুকে পড়ল। পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালতে গিয়ে দুটো কাঠি নষ্ট করল। তৃতীয় কাঠির আলোয় দেখা গেল, সাদা মত বস্তুটা আহামরি কিছু নয়, ছোট আকারের একটা সাদা কাগজের টুকরো।

হতাশ হল বাসব। আয়তনে দুই স্কয়ার ইঞ্চের বেশী হবে না। দাগ দেখে বুঝতে পারা যায় আগে কয়েক ভাঁজে মোড়া ছিল। হাত দিয়ে কাগজের টুকরোটা তুলে নিতে যাবার মুহূর্তেই একটা সম্ভাবনা মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল। হাত গুটিয়ে নিল। ভাবল মিনিট খানেক, তারপর রুমাল বার করে রুমালের সাহায্যে কাগজের টুকরোটা মুড়ে নিয়ে পকেটস্থ করল।

খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল বাসব।

দাঁড়াবার পরই কোমর টনটন করে উঠল। ঝুঁকে থাকার মাশুল। এ ঘরে আর কিছু করার নেই। হত্যাকারী মোটামুটি নিখুঁত ভাবেই নিজের কাজ শেষ করেছে বলা চলে। অবশ্য নিটোল অপরাধ কর্ম হয় না এতো জানাই কথা। কিন্তু টোলটা যে কোথায় পড়েছে সেটাই ধরা যাচ্ছে না।

বারান্দার দৃশ্য তখন অন্যরকম।

বাড়ির সকলে একধারে দাঁড়িয়ে। অধীর মিত্র একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেছেন পুরন্দরকে। কালীনাথের নামে তাঁকে চিঠি দেওয়া থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সমস্ত কথাই বলেছেন। দেখিয়েছেন চিঠিখানা। পুরন্দর সামন্ত শোনার পর অবাক হয়েছেন বলা চলে।

বলেছেন তারপর, ভেরি ইণ্টারেস্টিং।

—ইণ্টারেস্টিং তো বটেই।

—উইলটা খুঁজে দেখতে হয় কি বলেন?

মিত্র বললেন, খোঁজাখুঁজির কাজটা এখুনি করা যেতে পারে।

বাসব এসে দাঁড়াল।

পুরন্দর বললেন সব কথা।

—হত্যাকারীকে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না।—বাসব থেমে থেমে বলল, খুব ভেবে চিন্তেই প্ল্যানটা খাড়া করা হয়েছে। হত্যাকারী বিরাজমোহনের আদিঅন্ত জানতো। কালীনাথের বকলমে সকলকে চিঠি দেওয়া হল আগে। চিঠি পেয়ে সকলে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। সন্দেহভাজনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হল এইভাবে। পুলিশ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। এরপর আবার এই চিঠি।

মৃদু হেসে সামন্ত বললেন, হত্যাকারী রসিকও।

—বলতে পারেন। আপনারা এবার উইলের খোঁজ আরম্ভ করুন। আমি ততক্ষণ এঁদের সঙ্গে কথা বলি।

—বেশ।

সামন্ত ঘুরে দাঁড়ালেন।

বললেন গলা উঁচিয়ে, যে যাঁর ঘরে আপনারা চলে যান। মিঃ ব্যানার্জ্জী, আপনাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলবেন। ওঁর সঙ্গে সহযোগীতা করার অর্থই হল পুলিশকে সাহায্য করা।

কেউ কোন কথা বললেন না।

তবে নয়নতারা দেবী যে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েছেন, তাঁর মুখ দেখেই

বুঝতে পারা গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বারান্দা ফাঁকা হয়ে গেল। মিত্র আর সামন্ত ঢুকলেন বিরাজমোহনের ঘরে। বাসব চিন্তিত ভাবে মন্থর পায়ে সুবীরের ঘরের দিকে এগুলো।

সুবীরকে ঢুকতে দেখেছিল বলেই বুঝতে অসুবিধা হয়নি সে কোন ঘরে থাকে। মিনিট দশেকের বেশী লাগল না কথা শেষ করতে। জানাও গেলনা নতুন কোন কথা। বাসব এল পাশের ঘরে এবার। প্রণিমা জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল। বিব্রত ভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে এল।

বাসব বলল, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আপনার সম্পর্কে সমস্ত কথাই আমি জেনেছি। পুলিশকে যে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন তাও আমার দেখা। তবে—

—আর তো কিছু আমার জানা নেই। যা জানতাম পুলিশকে সবই বলেছি।

—ঠিক কথা। আচ্ছা, যে লোকটা আপনার ঘরে ঢুকেছিল, তার চেহারা মনে করতে পারেন?

—কি করে করবো বলুন? ঘরে তো তখন আলো ছিল না। আবছামত একটা ভাব ছিল। লোকটাকে শুধু পালিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

—দুর্ঘটনার পর আপনার মা এখানে এসেছিলেন।

—আজ সকালে এসেছিলেন। ঘণ্টা খানেক থাকার পর সোনারপুর ফিরে গেছেন। বলছিলেন, পুলিশ গিয়েছিল ওঁর কাছে।

—জানি। সোনারপুরের ঠিকানাটা কি?

প্রণিমা টেবিলের উপর রাখা প্যাড থেকে এক সিট কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে ঠিকানাটা লিখে দিল। আর কোন প্রশ্ন না করে, একপ্রস্থ ধন্যবাদ জানিয়ে বাসব বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এবার তাকে নীচে যেতে হবে।

ওদিকে—

সামন্ত উইলটা পেয়েছেন। খোঁজাখুঁজি বিশেষ করতে হয়নি। বিছানার মাথার দিকের গদির তলায় ছিল। নিজের হাতেই উইলটা রচনা করেছেন বিরাজমোহন। সামন্ত দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে দিলেন মিত্রর দিকে। পড়লেন মিত্র। তাঁর মুখে চোখে সন্তোষের ছায়া পড়ল।

সামন্ত প্রশ্ন করলেন, উইলটা জেন্যুইন, কি বলেন?

– নিশ্চয়।

—সকলকে উইলের সারমর্ম জানিয়ে দিতে নিশ্চয় কোন বাধা নেই?

—বাধা কিসের? এখনই জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

—আসুন।

সামন্ত মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় এলেন।

এই সময় বাসবও বেরিয়ে এল প্রণিমার ঘর থেকে।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, উইলটা পেয়েছেন নাকি?

মৃদু হেসে সামন্ত বললেন, হ্যাঁ। পত্রলেখক যেই হোক, তার দেওয়া সংবাদে কিন্তু কোন ভুল নেই।

—তাই তো দেখছি। এখন কি করবেন?

—মিঃ মিত্র'র সঙ্গে কথা বললাম। ওঁর ইচ্ছে এবং আমারও, উইলটা সকলকে পড়ে শুনিয়ে দেওয়া যাক।

দশ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা হল।

সকলে প্রণিমার ঘরে একত্রিত হলেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলেন খাটে এবং চেয়ারগুলোতে। কারুর মুখে হাসির লেস মাত্র নেই। গাম্ভীর্যের তকমা আঁটা। পুলিশী ঝামেলা ধারাবাহিক ভাবে কারুর ভাল লাগতে পারে না।

সামন্ত বললেন, আপনারা শুনলে খুসী হবেন, বিরাজমোহনের উইল আমরা খুঁজে পেয়েছি। তিনি বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন, নিজের অর্থ ও সম্পত্তি তিনি সুষ্ঠু ভাবে বণ্টন করেছেন বলেই আমরা বিশ্বাস

করি। যাহোক, মিঃ মিত্র সেই উইল আপনাদের পড়ে শোনাবেন।

সকলে নড়ে চড়ে বসলেন।

এমন একটা ব্যাপার হঠাৎ এসে পড়বে কেউ ভাবতে পারেননি। আশা ও সংশয়ের দোলায় সকলে দুলতে আরম্ভ করলেও, উৎকণ্ঠা যেন ক্রমেই সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করল।

মিত্র উইলের ভাঁজ খুললেন।

বাসব দেখল, পরিস্কার গোটা গোটা অক্ষরে বিরাজমোহন নিজের শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মিত্র পড়তে আরম্ভ করলেন—

আমি ·····নং এলগিন রোড নিবাসী বিরাজমোহন করগুপ্ত সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রশান্ত চিত্তে নিজের শেষ উইল রচনা করিতেছি। ইহার সহিত কাহারও কোন অনুরোধ উপরোধ বা প্ররোচনার সম্পর্ক নাই।

কৃষ্ণনগর নিবাসী, আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু প্রবীর মিত্র আজ আর ইহজগতে নাই। প্রথম জীবনে আমি তাঁহার অর্থ সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না পাইলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতাম না। সে ঋণ পরিশোধ করিবার মত স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবু প্রবীরের একমাত্র পুত্র সুবীরের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখিয়া যাইতেছি। সে এই অর্থ গ্রহণ করিলে আমার আত্মা শান্তিলাভ করিবে।

আমার আত্মীয়বর্গ সকলেই লোভী এবং স্বার্থপর। মনে প্রাণে আমি তাহাদের ঘৃণা করি। তবু ওই লোভী ও স্বার্থপরদের আমি বঞ্চিত করিতে চাহিনা। আমার বৈমাত্র ভ্রাতা ধীরাজমোহনকে ত্রিশ হাজার টাকা দিলাম। শর্ত একটাই, তাহাকে বসবাসের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে। আমার দূর সম্পর্কের ভগিনী নয়নতারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রেমকিশোর যথাক্রমে কুড়িহাজার টাকা পাইবে। কালীনাথ ঘোষ—আমার পুরাতন কর্মচারী। তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা দিলাম।

পরিচিত মহলের ধারনা আমি দাম্পত্য জীবন হইতে বঞ্চিত ছিলাম। ধারনাটি ঠিক নহে। প্রমীলাকে অগ্নীসাক্ষী করিয়া বিবাহ না করিলেও, সে আমার স্ত্রী মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং প্রণিমা আমার আত্মজা। জন্মদাতার প্রতি কন্যার রাগ এবং অভিমান থাকিতে পারে। ইহাই স্বাভাবিক। নানাকারণে উহাদের দীর্ঘদিন উপেক্ষা করার জন্য আমি নিদারুণ লজ্জিত। স্ত্রী ও কন্যার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থী।

নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, বাসগৃহ এবং স্থাবর-অস্থাবর-আর যাহা কিছু রহিল সমস্তই কন্যা প্রণিমাকে দান করিলাম। এই সঙ্গে আশীর্বাদ করিতেছি সে যেন যোগ্য স্বামী লাভ করে। আইন ঘটিত ব্যাপারে প্রখ্যাত এ্যাটর্ণী শ্রীঅধীর মিত্রর সহযোগীতা গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার জন্য দশহাজার টাকার ব্যবস্থা রাখিলাম। এই সঙ্গে উল্লেখ রাখিতেছি, উপরোক্ত সমস্ত অর্থই আয়কর মুক্ত এবং হোয়াইট মানি।

ভবদীয়,

শ্রী বিরাজমোহন করগুপ্ত।

'বিরাজ ভবন'

……নং এলগিন রোড।

কলিকাতা—

উইল পড়া শেষ করলেন অধীর মিত্র।

কারুর মুখে কথা নেই। গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। শুধু প্রণিমা চোখের জল সামলে রাখতে পাচ্ছেনা। কান্না যেন বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সুবীর ওর দিকেই তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। প্রণিমা মুখে আঁচল চাপা দিল।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন সামন্ত।

—ভালই হল বলা চলে। লোক হিসাবে বিরাজমোহন যে

খারাপ ছিলেন না। তা তিনি প্রমাণ করেছেন। কাউকে বঞ্চিত করেননি।

নয়নতারা বলে উঠলেন, তুমি আমায় কি সমস্ত বলেছিলে না? তার তো কিছুই ফলল না। ভারী হতাশ হলে বোধহয়?

ধীরাজমোহনকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছিল কথাটা।

থমথমে মুখ নিয়ে ধীরাজমোহন উঠে দাঁড়িয়ে অসংলগ্ন গলায় বললেন, এসমস্ত ধাপ্পা—আমি মানিনা—

বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে।

প্রেমকিশোরের মুখে তীক্ষ্ণ হাসি দেখা দিল।

—পৃথিবীতে কত রকম লোকই আছে। পরিশ্রম ছাড়াই ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছে, তবু মনে সুখ নেই।

—আপনি তাহলে সুখী—?

বাসবের দিকে তাকিয়ে প্রেম বলল, নিশ্চয়। ফাঁক তালে কুড়িহাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছি খুসী হব না। তাছাড়া মেজকাকা যে টাকাটা ধার দিয়েছিলেন, সেটাও আর ফিরিয়ে দিতে হবে না।

—ডবল লাভ বলুন?

—এক রকম তাই।

—আসুন, এবার বারান্দায় যাই। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে।

বাসবের পিছু পিছু প্রেম বারান্দার একপাশে এসে দাঁড়াল।

—বলুন?

—পুলিশকে কি বলেছেন আমি জানি। ও প্রসঙ্গে আর যাবনা। অন্য একটি বিষয়ের অবতারনা করতে চাই।

—আর কিছু তো আমি জানি না। যা জানতাম—মানে, পুলিশ যে প্রশ্ন করেছে আমি তার উত্তর দিয়েছি।

বাসব পাইপে মিক্সচার ঠাসতে ঠাসতে বলল, ঠিক কথা। তবে পুলিশ জানতে চাননি এমনও কিছু প্রশ্ন আমার থাকতে পারে।

কাঁপা গলায় প্রেমকিশোর বলল, পারে অবশ্য। তবে—

—নার্ভাস হবেন না। সঠিক উত্তর দিলে ভয়ের কোন কারণ নেই। আচ্ছা, মইটার সম্পর্কে আপনার কিছু বলবার আছে?

—কোন মই?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, বাগানে—আই মিন, আপনার মেজকাকার ঘরের নীচে সেদিন যে মইটা পড়েছিল—। মনে রাখতে হবে, ওখানে মইটা পড়ে থাকবার কথা নয়।

—হতে পারে। বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু মই সম্পর্কে কিছু জানি না।

—আমি আপনার কাছ থেকে সত্যি কথাটাই শুনতে চাইছি।

—আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলেছি মিঃ ব্যানার্জ্জী।

তীক্ষ্ণ গলায় বাসব বলল, বলেননি। আরো একটু সতর্ক হলে ভাল করতেন। আপনার বোঝা উচিত ছিল, অপরাধ বিজ্ঞানের একটা মামুলি সূত্র আপনাকে পরে বিপাকের দিকে ঠেলে দেবে।

—আমি—আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা।

বাসব কিন্তু বুঝতে পেরেছে তার ধাপ্পা কাজে লেগে যাবে।

—বেশ। আমি বুঝিয়ে বলছি। ওই মইটা থেকে আমরা হাতের ছাপ তুলেছি। সেই ছাপ যে আপনার, মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। ফিঙ্গার প্রিণ্ট এক্সপার্ট পুলিশের জীপে অপেক্ষা করছেন। যদি বলেন, ডেকে পাঠাতে পারি?

প্রেমকিশোরের শরীরে ঘামের বন্যা নামতে আরম্ভ করেছে।

খাবি খাওয়ার ভঙ্গীতে বলল, তার সঙ্গে খুনের কোন সম্পর্ক নেই।

—মই বেয়ে উপরে উঠেছিলেন স্বীকার করে নিচ্ছেন তাহলে। ভাল কথা। এরপরের কিছু ঘটনাও আমি আঁচ করতে পেরেছি। খোলা বারান্দার পথ দিয়েই আপনি বিরাজমোহনের ঘরে ঢুকে ছিলেন। কিন্তু মইটা স্থান চ্যুত হওয়ায় ওই পথ দিয়ে আর আপনার নেমে আসা সম্ভব হয়নি। অগত্যা আপনি পাশের

খোলা বারান্দায় লাফিয়ে পড়ে, প্রণিমা দবীর ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

প্রেমকিশোর ভীতমুখে চুপ করে রইল।

বাসব বলল আবার, আপনি দেখলেন, আমার আন্দাজ বাস্তবের কত কাছাকাছি। এবার আসল ঘটনাটা বলুন। চুপ করে থাকার অর্থই হল বিপদ ডেকে আনা। বোঝবার চেষ্টা করুন, সম্ভব হলে একমাত্র আমিই আপনাকে বাঁচাতে পারবো।

—আপনি বিশ্বাস করুন খুন সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা। মেজকাকা আগেই মারা গিয়েছিলেন। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ওখান থেকে সরে পড়ি।

—খুব ভাল কথা। আপনার কথা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আসল প্রশ্নের উত্তরটা তো পাওয়া গেল না। অসময়ে ফ্যাণ্টমের কায়দায় ও ঘরে আপনি ঢুকেছিলেন কেন?

—ঢুকেছিলাম······মানে······

—বলুন?

প্রেমকিশোর এবার সমস্ত কিছু ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে বলতে আরম্ভ করল, আমার অনেক টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল। কারণটা জানতে চাইবেন না। সকলেই জানে, মেজকাকার অনেক কালো টাকা আছে। উনি যে ভাবে নিজের শোবার ঘর পাহারা দিতেন তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, টাকাটা ওই ঘরেই আছে। সেদিন বিকেলে সকলে ওই ঘরে জড়ো হয়েছিলাম। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম খোলা বারান্দার সামনেকার দরজা ঘেঁসে। সকলের অলক্ষ্যে এক ফাঁকে ছিটকিনিটা খুলে রাখি। কালো টাকার পাহাড় থেকে কিছুটা সরিয়ে নেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। শেষ রাত্রে মই বেয়ে উঠলাম। তারপর ঘরে ঢুকে কি দেখেছি, ভয় পেয়ে কি ভাবে পালিয়েছি তাতো আপনি জানেন।

—এই হল আপনার কাহিনী? সমস্ত সত্যি বললেন আশা করি?

—অক্ষরে—অক্ষরে। মাথায় ভূত চেপে গিয়েছিল বলেই কাজটা করে ফেলেছি। আমায় বাঁচান মিঃ ব্যানার্জ্জী।

—সত্যি কথা বলে থাকলে ভয়ের কিছু নেই। ঠিক আছে, আর কোন জিজ্ঞাস্য নেই। এখন আপনি যেতে পারেন।

তৎপরতার সঙ্গে সামন্ত মোড় নিলেন।

ষ্টিয়ারিং এর উপর দুহাত রেখেই, ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, নতুন কোন কথা বোধহয় আপনি ওদের কাছ থেকে বার করতে পারেননি।

বাসবের মুখে জ্বলন্ত পাইপ।

—না। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পেরেছি।

—কোন ব্যাপারে ?

—প্রেমকিশোর সম্পর্কে যে অনুমান করেছিলাম তা সত্যি। বেকায়দায় পড়ে কথাটা স্বীকার করে নিয়েছে।

—এতে কি প্রমাণ হচ্ছে মিঃ ব্যানার্জ্জী ?

—এখনই জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। তবে—দেখুন, মূল সূত্রটা কাছে পিঠেই আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। আচ্ছা, উইল সম্পর্কে অপিনার ধারণা কি ?

—ভালই। শেষ পর্যন্ত যে বিরাজমোহন প্রণিমাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, এ কম কথা নয়। তাছাড়া—

—আমি কিন্তু উইলের শেষ কটা লাইন সম্পর্কে আগ্রহী। উনি লিখেছেন, উপরোক্ত সমস্ত অর্থ ই আয়কর মুক্ত এবং হোয়াইট মানি। অর্থাৎ কালো টাকাও তাঁর আছে। এঁদের কেউ কেউ সে কথা আমাদের বলেছেন ও। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই সমস্ত কালো টাকা গেল কোথায় ? আমার মনে এই বিশ্বাসই ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে, ওই টাকাই হল খুনের প্রকৃত মোটিভ।

—টাকাটা উনি অন্যত্র রেখেছিলেন।

—এখন তাই মনে হচ্ছে। তবে নিজের শোবার ঘর এমন সুরক্ষিত অবস্থায় রেখেছিলেন কেন ? নিশ্চয় অকারণে নয়।

—আমার মনে হয়। কালো টাকার বোঝা আগে ওই ঘরেই ছিল। কিছুদিন আগে উনি সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্যত্র। কিন্তু সকলকে ধোঁকা দেবার জন্য নিজের ঘরের সুরক্ষার ব্যবস্থা আগের মতই বজায় রেখেছিলেন।

বাসব বলল, একজন শুধু জানতো টাকাটা কোথায় আছে। লোভ তাকে সাপটে ধরেছিল। বলাবাহুল্য সেই হত্যাকারী।

—কে হতে পারে?

—অবশ্যই সে বিরাজমোহনের কাছের লোক।

—তাতো হবেই—সামন্ত বললেন, প্রেমকিশোর বোধহয় সেই লোক নয়।

—না। কেন নয়, আপনাকে আগেই বলেছি। পোষ্টমর্টমের রিপোর্ট আমার যুক্তিকে সমর্থন করেছে।

—মোটামুটি আপনি কি রকম বুঝছেন তাই বলুন?

—খুব খারাপ বুঝছি না। এই কেশের একটা সুরাহা তাড়াতাড়িই হবে। ভাল কথা, আমি একবার প্রমীলাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—সোনারপুর যাবেন?

—আপনারা অবশ্য কথা বলেছেন। আমিও একবার মহিলার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—বেশ তো। কবে যেতে চান?

—কাল সকালে।

হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের মুখে এসে জীপের মুখ ঘোরালেন সামন্ত। বললেন, ডিপার্টমেণ্টের একজনকে সঙ্গে দিয়ে দেব। পুলিশের লোক সঙ্গে থাকলে মহিলা অসহযোগীতা করতে সাহসী হবেন না।

—ঠিক আছে। ভোরেই পাঠিয়ে দেবেন তাকে। বাই কার যাব।

নটা বাজার কয়েক মিনিট আগেই বাসব সোনারপুর পৌঁছে গেল। কলকাতা থেকে 'রওনা হতে সামান্য বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল, নয়তো আরো আগাম পৌঁছে যেত।

শৈবালের হাতে একটা অপারেশন থাকায় সে আসতে পারেনি। অবশ্য গোয়েন্দা দপ্তরের সুদেব সোম আছে।

ষ্টেশনের একপাশে গাড়ী রেখে ওরা এগুলো।

জানা থাকলেও ছোট জায়গায় সময় সময় ঠিকানা খুঁজে পাওয়া ঝামেলার ব্যাপার হয়ে পড়ে। সামনেই একটা চায়ের দোকান। আড্ডাখানা বলাই ভাল। এখানে সঠিক হদিস পাওয়া যাবেই। বাসবের অনুমান মিথ্যা নয়। একজনকে প্রশ্ন করতেই জানা গেল, সামনের রাস্তা ধরে শতিনেক গজ যাবার পর, বাঁ ধারে হলদে রং-এর একতলা একটা বাড়ি পাওয়া যাবে, ওটাই।

সঠিক নির্দেশই পাওয়া গিয়েছিল।

বারকয়েক কড়া নাড়বার পর দরজা খুলে গেল। সধবা এবং বিধবার মাঝামাঝি রফা করে নেওয়া পোষাকে সজ্জিতা মহিলা দরজার মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালেন।

দুচোখে বিস্ময়ের ছায়া। বাসব এক নজরেই বুঝতে পারল, মহিলা এককালে বেশ সুশ্রী ছিলেন। তাঁর চেহারার ছাপই মেয়ের উপর পড়েছে।

—আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে। —বাসব বলল, বিরাজবাবুর হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার আমাদের উপর রয়েছে। আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। বাড়ির ভেতরে যাবার যদি অনুমতি করেন, তবে—

দ্রুত গলায় প্রমীলা বললেন, ভেতরে আসুন। আমি কিন্তু—

সুদেব নিজের পরিচয় পত্র এগিয়ে ধরে বলল, ইনি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা। এঁর সঙ্গে সহযোগীতা করার অর্থই হল পুলিশকে সাহায্য করা।

প্রমীলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, আমি আর কি জানি বলুন? ঘটনাস্থলে তো আর ছিলাম না।

বাসব বলল, জানি। আপনার সঙ্গে পুলিশের কি কথাবার্তা হয়েছে তাও আমার জানা আছে। কথাটা কি জানেন, অতীতে দেখা গেছে, যিনি খুন হয়েছেন তাঁর সম্পর্কে যত বেশী জানা যায় রহস্যের আবরণ তত স্বচ্ছ হয়ে আসে। এই কারণেই আপনার কাছে আমার আসা।

—ভেতরে আসুন।

প্রমীলার পিছু পিছু ঘরে ঢুকলো দুজনে। দামী আসবাব পত্র না থাকলেও ঘরখানা বেশী পরিস্কার এবং সাজানো গোছানো। মোরাদাবাদী বেতের নীচু আকারের দুখানা চেয়ার অধিকার করল বাসব ও সুদেব। প্রমীলাও বসলেন।

ক্লান্ত গলায় বললেন, মেয়ের জন্য আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। ওখানে আটকে রয়েছে তো। ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই। বলুন, কি জানতে চান?

—প্রণিমাদেবীর জন্য চিন্তিত হবেন না। বাসব বলল, ওখানে উনি ভালই আছেন। আচ্ছা 'বিরাজ ভবনে' আপনি আগে কখনও গেছেন?

—বহু বছর আগে একবার গিয়েছিলাম। তখন বাড়িখানা সবে কেনা হয়েছে।

—বিরাজবাবুর সঙ্গে কিভাবে সংযোগ ঘটেছিল তা জানতে চেয়ে আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। আপনি বলুন হঠাৎ উনি আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দূরে সরে গেলেন কেন?

ইতস্ততঃ করে প্রমীলা বললেন, মন ভরে গিয়েছিল বোধহয়।

—তাই কি?

—আবার এমনও হতে পারে, উনি অত্যন্ত খেয়ালী লোক ছিলেন, খেয়ালের বশবর্তী হয়েই হয়তো দূরে চলে গিয়েছিলেন। কিম্বা—

—বলুন ?

—হয়তো অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। তবে আমার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে শেষ করে দেননি।

—কি রকম ?

—আমাকে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন।

—এমাসে পাঠিয়ে ছিলেন ?

—হ্যাঁ। সাত তারিখে টাকাটা পেয়েছি।

—কিছু মনে করবেন না। কত পাঠাতেন ?

—আড়াইশ টাকা। ওঁর অসীম অনুগ্রহ। টাকাটা না পেলে আমার বেঁচে থাকা দুস্কর হত।

—ওই টাকায় আপনার সংসার চলে যায় ?

—কেন যাবে না, বলুন ? বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না। বাড়িখানা উনি আমায় কিনে দিয়েছিলেন। একলা মানুষ—। মেয়ে ছোটবেলা থেকেই বোনের কাছে থাকতো। বড় হবার পর কাজ করছে। তাছাড়া আমিও টুকটাক করি।

—আচ্ছা, টাকাটা লোক এসে দিয়ে যেত ?

—না। মণিঅর্ডার আসতো।

—বিরাজবাবু নিজের হাতে মণিঅর্ডারের ফর্ম ভরতেন ?

—আগে নিজেই লিখতেন। এবারে···মানে···বছর তিনেক ধরে উনি আর লিখতেন না। হাতের লেখাটা অন্যকারুর।

—কুপনে কিছু লেখা থাকত কি ?

প্রমীলা একটু থেমে বললেন, উনি নিজে কোন কথা লিখতেন না। ইদানিং লেখা থাকতো। মামুলি দুচার কথা।

—যেমন—

—'এত টাকা পাঠান হল। প্রাপ্তি সংবাদ দেবেন।' নীচে কোন নাম থাকত না। প্রতিবারই আমি একটা পোষ্টকার্ড লিখে প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে দিতাম।

বাসব ভ্রু কুঁচকে কি চিন্তা করল।

বলল তারপর, কুপনগুলো দেখতে পেলে ভাল হত। পাওয়া যাবে কি?

—কেন পাওয়া যাবে না। আমার কাছে সব কুপনই আছে। যত্ন করে প্রত্যেকটা রেখে দিয়েছি।

—চমৎকার। সব দরকার নেই। এবারের কয়েকখানা পেলে ভাল হত।

—এনে দিচ্ছি।

প্রমীলা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

সুদেব এতক্ষণ চুপচাপই প্রশ্ন-উত্তর শুনছিল। তবে তাকে কিছুটা নিরাশ হতে হয়েছে। বাসব এই ধরণের মামুলি সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করবে ভাবতে পারেনি। বড় কর্তারা বাসবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ—

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলব—

—বলুন?

আপনার প্রশ্নগুলো—

—পানসে লাগল বুঝি? কথাটা কি জানেন, আমার কাজের ধারাই এরকম। তুচ্ছ সমস্ত ব্যাপার থেকেই অতীতে আমি বহুবার বিরাট সূত্রের কাঠামো গড়ে তুলেছি। আজকের কথাই ধরুন না—

—আপনি কি—

—হ্যাঁ। এখানে না এলে অন্ধকার হাতড়ানো আমার বন্ধ হত না। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলার পর এখন মনে হচ্ছে, বার আনা কাজই শেষ হয়ে গেল।

—বলেন কি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি।

বাসব মৃদু হাসল।

—আমার ধারণায় মণিঅর্ডারের ব্যাপারটাই মূল চাবিকাঠি।

—বিরাজমোহন এঁকে টাকা পাঠাতেন, এরমধ্যে রহস্যের কি আছে ?

—রহস্য ওখানে নয়। পরে যার হাতের লেখা মণিঅর্ডার ফর্মে থাকতো আমি তাকেই মিন করছি। অর্থাৎ সেই লোক বিরাজমোহনের বিশেষ আস্থাভাজন। অর্থাৎ সেই লোক বিরাজমোহনের সমস্ত কিছুই জানে। অর্থাৎ কালো টাকা কোথায় জমা রাখা হত তাও তার হয়তো অজানা নয়। অর্থাৎ—এই রকম আরো বহু অর্থাতের বোঝা আমি অচিরেই এবার হাল্কা করে ফেলতে পারব।

সুদেব আর কিছু বলতে পারল না।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বাসবের দিকে।

প্রমীলা আরো কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলেন। একটা ট্রে বয়ে এনেছেন। ট্রেতে দু-কাপ ধূমায়িত চা, আর বড় একটা প্লেটে চারটে বাড়ির তৈরী নারকেলের মিষ্টি। এত তাড়াতাড়ি চা কি ভাবে তৈরী করা সম্ভব হল বাসব ভেবে পেল না।

বলল, কি দরকার ছিল এসমস্তর।

প্রমীলা বললেন, ও কথা বলবেন না। এতদূর এসেছেন, সামান্য জলযোগ করবেন না তা কিভাবে হয়। আপনারা আরম্ভ করুন আমি জল নিয়ে আসি।

উনি আবার পাশের ঘরে চলে গেলেন।

দক্ষিণ হাতের কাজ শেষ হতে মিনিট দশেক লাগল।

বাসব এবার মণিঅর্ডারের কুপনগুলো নিয়ে পড়ল। একটা প্লাষ্টিকের খাপের মধ্যে একগোছা কুপন ছিল। সমস্তই চলতি বছরের। বাসব সাগ্রহে ওগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। শেষে—

—একটা কুপন নিতে চাই।

প্রমীলা বললেন, নিন না। সত্যি কথা বলতে এগুলো আর আমার কোন্ কাজে লাগবে ?

—এবার তাহলে উঠি। সহযোগীতার জন্য ধন্যবাদ।

—কি আর এমন সহযোগীতা। আপনাকে দেখেতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। না জানি, কি সমস্ত জিজ্ঞেস করবেন—

—আপনার সহযোগীতা যে কত মূল্যবান বলে বোঝাতে পারব না। ভাল কথা, আপনাকে একটা সুসংবাদ দিই। বিরাজবাবু, প্রণিমা-দেবীকে উইল করে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েগেছেন। বাড়িখানাও।

প্রমীলা হতবাক হয়ে গেলেন।

কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

বাসব আবার বলল, বাস্তব সময় সময় কাহিনীকে ছাপিয়ে যায়। যা বললাম বর্ণে বর্ণে সত্যি। বিরাজবাবু আপনাদের স্বাচ্ছন্দের ভাল ব্যবস্থাই করে দিয়ে গেছেন। এখানে আর অপেক্ষা করবেন না। এখন আপনার মেয়ের কাছে গিয়েই থাকা উচিত। চলি আজ—

কালীনাথ জড়সড় ভাবে বসেছিল। অবস্থা তার 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচির' মত। বাসব সামনের সোফায় বসে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে। কালীনাথকে একবার ভাল ভাবে দেখে নিয়ে সেণ্টার টপের উপর পাইপ নামিয়ে রাখল।

বলল, আপনি এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? আপনি যে আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন এতে তো ভালই হল। আমার আন্দাজটা যে ঠিক তা প্রমাণ করার সুযোগ পেলাম।

কাঁপা গলায় কালীনাথ বলল, আমার কোন বিপদ হবে না তো?

—বিপদ! কেন—? লোভকে জয় করে আমাকে যখন সব কথা বলে ফেলেছেন তখন আর কোন বিপদ নেই। আপনি যাতে সহজ ভাবে সমস্ত কিছু বলতে পারেন, তাইতো আপনাকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছি। ভাল কথা, এখন ওখানকার খবর কি?

—কোন খবরের কথা বলছেন?

—কে কি বলছে আর কি?

—ধীরাজবাবু রেগে আছেন। গজগজ করছেন সব সময়।

—কেন ?

—উইলের বয়ান ওঁর ভাল লাগেনি।

—এতে কারুর কিছু বলার থাকতে পারে না। বিরাজবাবু নিজের সম্পত্তি ইচ্ছে মত দান করার অধিকারী ছিলেন। নয়নতারা দেবীও বোধ হয় খুসী নন।

—না।

—ঠিক আছে, এবার আপনি যেতে পারেন।

এক মিনিট সময় নষ্ট না করে কালীনাথ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। বাসব মৃদু হাসল সে দিকে তাকিয়ে। তারপর উঠে গিয়ে ফোন ষ্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়াল। ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে একটা নম্বর ডায়েল করতে লাগল। কয়েক বার রিং হবার পর সাড়া পাওয়া গেল।

—কে কথা বলছেন—

—

—প্রেমকিশোরবাবু—নমস্কার—আমি বাসব—দয়া করে প্রণিমা দেবীকে ডেকে দেবেন—দরকার ছিল—

রিসিভার হাতে নিয়ে মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করার পর সাড়া পাওয়া গেল।

—কে, প্রণিমাদেবী—নমস্কার—এই সময় বিরক্ত করার জন্য দুঃখীত—

—

—একটা সহযোগীতা চাই—ভাল কথা—আপনার মা এসেছেন নিশ্চয়—গতকাল আমি সোনারপুর গিয়েছিলাম—

—

—এরকম পরিস্থিতিতে একটু অস্বস্তিবোধ আসবেই—ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে—যা বলছিলাম—আপনার সহযোগীতা চাই—

বাইরে এই সময় যান্ত্রীক শব্দ পাওয়া গেল। গাড়ী বারান্দার নীচে

তখন লালবাজার থেকে আগত জীপটা এসে থেমেছে। সামন্ত জীপ থেকে নামলেন। গৃহকর্তাকে খবর পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পর্দা সরিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করার পরই লক্ষ্য করলেন, বাসব ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখছে।

—আসুন, মিঃ সামন্ত। নতুন কোন সংবাদ আছে নাকি ?

সামন্ত বসতে বসতে বললেন, আমি তো আপনার কাছে এলাম সংবাদের আশায়।

মৃদু হেসে বাসব বলল, একটা ভাল সংবাদ এখন প্রস্তুতির পথে। প্রণিমা করকে এইমাত্র ফোন করলাম। কালীবাবুকে ডেকে ছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ হল গেছেন। সব মিলিয়ে পরিবেশ জমিয়ে তোলার চেষ্টা করছি।

—তার মানে কেসটা এখন আপনার হাতের মুঠোয়।

—অনেকটা তাই। বাহাদুর এল বলে। চা খেয়েই আমরা বিরাজ ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হব। তারপর দেখতে হবে, আমি যে জাল ফেলেছি তাতে মাছ ওঠে কিনা।

প্রণিমা আধবোঁজা চোখে বিছানায় শুয়ে আছে। প্রমীলা খাটের ছত্রিধারে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখে উদ্বিগ্নতার ছায়া। সুবীর দাঁড়িয়ে আছে জানলার ধারে। কিছুটা সচকিত সে। রজত সেন এতক্ষণ প্রণিমার শরীর পরীক্ষা করছিলেন। এখন টেবিলের উপর প্যাড রেখে প্রেসক্রিপশন লিখছেন।

প্রেসক্রিপশন লেখা হয়ে গেলে ডাঃ সেন বললেন, সাময়িক দুর্বলতার জন্যে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। চিন্তার কোন কারণ নেই। মিস কর, উঠে পড়ুন। ওষুধ লিখে দিয়েছি। বিকেলের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

কিছুক্ষণ আগে বাথরুম থেকে বেরুবার পরই প্রণিমার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। চেষ্টা করেও দেওয়াল ধরতে পারেনি, পড়ে গিয়ে-

ছিল মাটিতে। বারান্দায় তখন সুবীর আর প্রেমকিশোর দাঁড়িয়েছিল। ছুটে এসেছিল ওরা। তারপরই কালীনাথ ডেকে এনেছিল ডাঃ সেনকে। এই ব্যাপারে বাড়িতে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। সকলে জড় হয়েছেন বারান্দাতে।

রজত সেন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই নয়নতারা প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?

—বিশেষ কিছু না। মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

—বোঝ ব্যাপারখানা। একগাদা টাকা পাচ্ছে তো, এখন মাথা ঘুরলেও ডাক্তার দরকার হয়। আগে বোধহয় টাইফয়েডেও কবিরাজ আসতো না।

বিরক্তির সুরে ধীরাজমোহন বললেন, তুমি থামবে?

—কেন থামবো? আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। কোথা থেকে হুট করে এসে একেবারে জমিয়ে বসলো। আবার মাও এসে জুটেছে সঙ্গে।

—এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার লোক আমি নই। চুপচাপ দেখে যাওনা আমি কি করি। এমন একখানা চাল দেব যে—

—বেশী চাল মারতে যেও না—প্রেমকিশোর বলে উঠল, হুড়মুড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে। তখন সত্যি খেলাটা জমে যাবে।

—প্রেম, বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে।

প্রেমকিশোর নির্বিকার গলায় বলল, আছে কিনা জানি না। তবে আমি বাড়াবাড়ি করবই। তোমার সাধ্য থাকলে বাধা দাও।

ধীরাজমোহন প্রায় চীৎকার করে উঠলেন।

—তুমি ভেবেছোটা কি? মুখে যা আসবে তাই বলবে! তুমি কি মনে কর, আমি তোমার খেয়ে পরে বেঁচে আছি।

প্রেমকিশোর কিছু বলার আগেই পুরন্দর সামন্তকে উপরে উঠে আসতে দেখা গেল। পিছনে বাসব। দুজনের কানেই তপ্ত বাক্য বিনিময়ের কিছুটা গিয়েছিল। গোলমালটা কি নিয়ে সামন্ত আঁচ করে নিয়েছিলেন। উনি এসে দাঁড়ালেন সকলের প্রায় সামনে।

কিছুই জানেন না এমন ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলেন, বিশেষ কিছু ঘটেছে কি ?

—নতুন আর কি ঘটবে ?—প্রেমকিশোর বলল, আমি কিছু বলতে গেলেই আমার পরম পূজনীয় পিতৃব্য রেগে আগুন হয়ে উঠছেন। আসল কথাটা হচ্ছে, উইলের বক্তব্য ওঁর পছন্দ নয়।

—তাই কি ?

তীক্ষ্ণগলায় ধীরাজমোহন বললেন, হ্যাঁ, তাই। ওই মেয়েটা দাদার, একথা আমায় বিশ্বাস করতে হবে ? এ সমস্ত পাগলামী বন্ধ করুন। আমি হলাম ওঁর নিকটতম আত্মীয়। ওঁর যা কিছু আছে আমি তার একমাত্র দাবীদার।

শান্ত গলায় সামন্ত বললেন, এ সমস্ত কথা অর্থহীন। যা কিছু লেখবার আপনার দাদাই লিখে গেছেন। তাঁর নির্দেশ মেনে চলতেই হবে।

—আমি মানবো না।

—গায়ের জোরে সব কিছুর সমাধান করা যায় না। আপত্তি থাকলে আইনের আশ্রয় নিন। কোর্টের দরজা খোলা আছে। সেখানে যান।

এবার নয়নতারা ঝলসে উঠলেন।

—উইলটা জাল নয় তার প্রমাণ কি ?

—আপনার ক্ষেত্রেও ওই এককথা। সন্দেহ জেগে থাকলে উইল চ্যালেঞ্জ করুন। তবে আমার ব্যক্তিগত মত যদি নেন, বলব, পণ্ডশ্রম করবেন না। উইলটা জেনুইন। কোর্টে তা প্রমাণ হবে। মাঝ থেকে আপনারা হাস্যাস্পদ হবেন।

সামন্ত এবার ফিরলেন।

—কালীবাবু, কয়েকটা চেয়ারের ব্যবস্থা করুন এখানে। তদন্তের ব্যাপারে সকলের সঙ্গে আমাদের কিছু আলোচনা আছে।

ত্রস্ত গলায় কালীনাথ বলল, চেয়ারের ব্যবস্থা এখুনি হচ্ছে।

আমাকেও কি থাকতে হবে স্যার? নইলে ওষুধটা কিনে নিয়ে আসতাম।

—ওষুধ! কার শরীর খারাপ—

রজত সেন এগিয়ে এলেন।

—মিস করের শরীর সামান্য খারাপ হয়েছিল। এখন ভাল আছেন।

—ও। কালীবাবু, আপনি চেয়ারের ব্যবস্থাই করুন। প্রেস-কিপশনটা আমায় দিন। কনেষ্টবলদের দিয়ে ওষুধটা আনিয়ে দিচ্ছি।

দশ মিনিটের মধ্যে বারান্দায় চেয়ারের ব্যবস্থা হল। সকলে বসলেন বেজার মুখে। প্রমীলাও এলেন। প্রণিমাও এসে বসল। বাসব এতক্ষণ কথা বলেনি। একপাশে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিল। এবার মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে সামন্তর পাশের চেয়ারখানা দখল করল।

বলল, উইলের প্রসঙ্গটা শেষ হয়ে গেছে বলে আপনারা ধরে নিন। সত্যি, ওনিয়ে কথা বাড়িয়ে আর কোন লাভ নেই। যাহোক, এবার আমি তদন্তের কথাতেই আসছি। এই কেসের সঙ্গে আমি সরাসরি ভাবে যুক্ত নয় আপনারা জানেন। মিস্টার সামন্তর অনুরোধে আমি আগ্রহ না দেখিয়ে পারিনি। আপনারা শুনে খুশী হবেন তদন্তের ব্যাপারে আমরা মোটামুটি শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছি।

বাসব থামল।

কেউ কিছু বললেন না।

বাসব আবার বলতে আরম্ভ করল, যে কোন খুনের প্রথম কথা হল মোটিভ। রাগের মাথায় কিছু ঘটে গেল, সে স্বতন্ত্র কথা। প্ল্যান করে যে খুন হবে তার পিছনে একটা মোটিভ থাকতে বাধ্য। আবার এই মোটিভই অনেক ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেয়। কাজেই তদন্তকারীকে প্রথমেই মোটিভের সন্ধান করতে হয়। আমরাও বিরাজবাবুকে হত্যা করার নেপথ্যে যে আসল কারণ আছে

তার সন্ধান পেয়েছি। উইলে যে হিসাবটা আপনারা দেখলেন, স্বাভাবিক কারণেই ওটা সাদা টাকা। অথচ আপনারা প্রায় সকলেই জানতেন, বিরাজবাবুর প্রচুর কালো টাকা আছে। তাঁর মৃত্যুর পর কিন্তু সেই টাকার সন্ধান পাওয়া গেল না। মোটিভ ওটাই। সুতরাং আমায় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে কেউ একজন ওই টাকা আত্মসাৎ করার জন্যই বিরাজবাবুকে হত্যা করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঘটনাটা ঘটল কি ভাবে? বলাবাহুল্য হত্যাকারী একজন চতুর ব্যক্তি। ভেবে চিন্তে সে প্ল্যানটা খাড়া করেছিল নিপুণ ভাবে।

প্রেমকিশোর কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাতের ইসারায় তাকে সামন্ত বললেন, আগে ওঁকে সব কথা বলতে দিন।

বাসব বলে চলল, হত্যাকারী এমন একজন লোক যাকে বিরাজমোহন বিশ্বাস করতেন। নিজের জীবনের সব কথাই নিশ্চয় বলেছিলেন। কাজেই ভাল একটা প্ল্যান খাড়া করতে হত্যাকারীর কোন অসুবিধা হয়নি। এবার খুনের ধরণের কথায় আসা যাক। পোষ্টমর্টমের রিপোর্ট বলছে, উনি মারা গেছেন রাত একটার মধ্যে। ঘরের প্রধান দরজা ভেতর দিক থেকে তালা দিয়ে বন্ধ ছিল। খোলা বারান্দার পথ দিয়ে কেউ এসে গভীর রাতে ওঁকে কিছু খেতে বলল উনি সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেললেন, একথা নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য নয়। ব্যাপারটা তাহলে ঘটেছিল কি ভাবে? আসল কথা হল, বিরাজমোহনের মৃত্যুর সময় হত্যাকারী তাঁর ধারে কাছে ছিল না। সে এমন ব্যবস্থা করেছিল যাতে বিবাজমোহন নিজেই সায়নাইড খেয়ে মারা গিয়েছিলেন।

সুবীর বিস্মিত গলায় বলল, ষ্ট্রেঞ্জ। এবার নিশ্চয় বলবেন নাটের গুরুকে?

—সে কথাতেই এবার আসছি।

বাসব আরেক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, ডাঃ সেন, আপনার

সঙ্গে ছোট্ট একটা প্রতারণা করার জন্য আমি দুঃখীত।

রজত সেন অবাক হলেন।

—প্রতারণা! আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কি হয়েছে বলুন তো?

—কিছুক্ষণ আগে আমি প্রণিমাদেবীকে ফোন করে বলেছিলাম, উনি যেন অসুস্থতার ভান করেন। পেট ব্যথা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি এমন রোগ যা চিকিৎসকরা চট করে ধরতে পারে না. অথচ রোগীকে বিশ্বাস করে। আসল কথাটা হল, এই সময় আপনাকে আমার এখানে দরকার ছিল।

—কেন বলুন তো?

বাসবের মুখে বিচিত্র হাসি খেলে গেল।

—এত কথা শোনার পরও প্রশ্ন করছেন, কেন! পরিকল্পনাটা ভালই করেছিলেন। তবে পেশাদার নন তো, তাই কিছু ফাঁকফোকর রয়ে গিয়েছিল। ওই একটা ফোকর দিয়ে গলে যেতে পেরেছি বলেই আপনার আসল রূপটা এত তাড়াতাড়ি আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হল।

রজত সেন ঝটিতে উঠে দাঁড়ালেন।

প্রায় চীৎকার করে বললেন, কি সমস্ত বকছেন? কিসের পরিকল্পনা? একজন ভদ্রলোককে অপমান করার পরিণাম কি জানেন?

—জানি বইকি। সমস্ত রকম দায়িত্ব নিয়েই আমাকে বলতে হচ্ছে, আপনি ঠাণ্ডা মাথায় যে একটা খুন করেছেন, আপনাকে দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। দুর্ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বার এ বাড়িতে যখন ফিরে আসেন, তখন একটা ওষুধের ব্যবস্থা আপনি করেছিলেন। হয়তো বলেছিলেন শুতে যাবার আগে খেয়ে নিতে। এতে কোন অস্বাভাবিকত্ব ছিল না। গৃহচিকিৎসক হিসাবে এরকম নির্দেশ আপনি সহজেই দিতে পারেন। সরল বিশ্বাসে বিরাজ-

মোহন কোন পাউডার জাতীয় ওষুধের মেশানো সায়নাইড খেয়ে ফেলেছিলেন।

—আপনি এ সমস্ত প্রমাণ করতে পারবেন ?

—কোর্টে প্রমাণ দাখিল করার দায়িত্ব আমার নয়, পুলিশের। পুলিশের পক্ষ থেকে সে ব্যাপারে উপযুক্ততার পরিচয় যে দেওয়া হবে তাতে সন্দেহ নেই। তবে সামান্য দু চারটে প্রমাণ এখনই যে উপস্থিত করতে না পারি তা নয়। যেমন ধরুন, যে মোড়কে ওই বিশেষ ধরণের ওষুধ বিরাজমোহনকে দিয়েছিলেন, আমি সেটা খাটের তলা থেকে উদ্ধার করেছি। পরীক্ষা করলেই তাতে সায়নাইডের উপস্থিতি ও আপনার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে। যে গেলাসে উনি ওষুধ গুলে খেয়েছিলেন, পরের দিন সকালে এসে ওটা সরিয়েছেন আপনি। কি বলেন কালীবাবু ?

কালীনাথ ত্রস্ত গলায় বলল, আমি তো তাই দেখলাম স্যার। সকলে যখন মড়া নিয়ে ব্যস্ত উনি তখন মাটি থেকে গেলাসটা তুলে নিয়ে ব্যাগে ভরলেন।

—গেলাসটা সরানো দরকার ছিল। বাসব বলল, ডাঃ সেন, আপনি চাননি প্রমাণ হোক, বিষ বিরাজমোহন নিজেই খেয়েছেন। কারণ, সন্দেহটা তাহলে বাড়ির কারুর না কারুর উপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সকলের মনেই বোধহয় প্রশ্ন জাগছে, গেলাস ঘটিত ব্যাপারটা কালীবাবু জানেন এ কথা আমি জানলাম কি ভাবে ? ধীরাজবাবুর একটা কথা আমাকে সচকিত করেছিল। তিনি জানান, কালীবাবু নাকি বলেছেন. এখানে চাকরী না থাকলেও ওঁর কোন অসুবিধা নেই। অনেক টাকা পেতে চলেছেন। আমি ব্ল্যাক মেলিং এর গন্ধ পেলাম। কালীবাবুকে ডেকে পাঠালাম বাড়িতে। চেপে ধরলাম। উনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, ডাক্তারবাবুকে গেলাসটা সরিয়ে ফেলতে দেখেই উনি বুঝতে পেরেছিলেন খুনটা কে করেছে। ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার একটা পরিকল্পনা ওঁর ছিল।

বাসব দম নিয়ে আবার বলতে থাকল, বিরাজমোহন যে ডাঃ সেনকে বিশ্বাস করতেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, নিজের গুপ্তজীবন সম্পর্কে সব কথাই জানিয়ে ছিলেন এবং প্রমীলাদেবীকে মাসে মাসে টাকা পাঠাবার ভার ইদানিং ওঁকেই দিয়েছিলেন। কিছু মনিঅর্ডার কুপন আমি সংগ্রহ করেছি। তাতে যে হাতের লেখা আছে তার সঙ্গে, কিছুক্ষণ আগে প্রণিমাদেবীর জন্য যে প্রেসকিপশন করেছেন তার লেখা মিলে যাবে। বিরাজমোহনের প্রেসকিপশনের সঙ্গে আমি মিলিয়ে দেখেছি—হাতের লেখা এক।

রজত সেন কিছু বলতে গিয়েও বললেন না।

—কালো টাকা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, সেই বিপুল অর্থ এ বাড়িতে নেই। বিরাজমোহন বিশ্বাসী ডাঃ সেনের হাত দিয়ে টাকাটা অন্যত্র সরিয়েছিলেন নিজেকে আইনের চোখে নিরাপদ রাখার জন্য। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মৃত্যুর পরওয়ানাতেও স্বাক্ষর করেছেন। আমার মনে হয়, ডাঃ সেনের বাড়ি বা চেম্বার তল্লাস করলেই টাকাটা পাওয়া যাবে। এ সমস্ত কাজে পুলিশের দক্ষতা সন্দেহাতীত। মিঃ সামন্ত, এবার উঠলাম। কাল কোন সময় লালবাজার আসছি।

বাসব উঠে দাঁড়াল।

রজত সেন এখনও নিশ্চুপ। চেয়ারে একটু হেলে বসে আছেন। চোখ আধবোঁজা। ঘামের বন্যা মুখের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে।

॥ দুই ॥

গ্রেট কোটের কলার আরো একটু তুলে দিল বাসব। শীত বেশ চেপে পড়েছে। অবশ্য পাঠানকোটে এই রকম জলহাওয়া থাকাটাই স্বাভাবিক। অসময়ে সুদূর কলকাতা থেকে এখানে আসাটা পাগলামী। বাসবকে আসতে হয়েছিল একটা তদন্ত হাতে নিয়ে। সরকারী দলিল চুরি যাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল—কেসটার কিনারা করতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত। আজ ফিরে চলেছে দিল্লী। ওখান থেকে কলকাতার গাড়ী ধরবে।

সবে মাত্র স্টেশনে পা দিয়েছে। ঝকঝকে ফ্রন্টিয়ারমেল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পনেরোখানা বগিকে ডিজেল ইঞ্জিন টেনে নিয়ে যাবে দুরন্ত গতিতে। ঘণ্টা পড়ে গেল। বাসব দ্রুত পায়ে এগুলো কামরার দিকে। মালপত্র অবশ্য বিরাট কিছু নয়—মাঝারি সাইজের সুটকেশ আর বেডিং। এয়ার কণ্ডিশন কামরার সামনে কনডাক্টর দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে টিকিট এগিয়ে ধরে বাসব কামরার গায়ে সাময়িক ভাবে আটকানো যাত্রী তালিকার দিকে তাকাল। মাত্র আটজনের নামে রিজার্ভেশন আছে। কনডাক্টর টিকিট চেক করে ফিরিয়ে দিল।

বাসব বলল, আজ তো বগি প্রায় খালি চলেছে?

—ফুল ছিল। শেষ সময় কয়েকজন যাত্রা বাতিল করেছেন। আপনার বার্থ খুঁজে নিতে অসুবিধা হবে নাতো স্যার। 'ই' কম্পার্টমেণ্টের লোয়ার বার্থ।

—ওটা তো কুপে, না।

—হ্যাঁ, স্যার।

বাসব বগির মধ্যে প্রবেশ করল। শীততাপ নিয়ন্ত্রণের চমৎকার ব্যবস্থা। গ্রেট কোটের আর প্রয়োজন নেই। খুলে হাতে ঝুলিয়ে

নিয়ে টানা করিডোর ধরে এগুলো। স্যুটকেশ আর বেডিং সমেত কুলি পিছনে। 'ই' কম্পার্টমেণ্টের দরজা সরিয়ে বাসব ভেতরে ঢুকলো। তার সহযাত্রী এখন এসে উপস্থিত হননি। কুলিকে বিদায় করে দিয়ে বসল বার্থের উপর। তারপর পাইপ ধরাল।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে এসেছে। ট্রেন ছাড়লেই শুয়ে পড়বে। করিডরে কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বাকী যাত্রীরা সব এসে পড়েছেন। এই সময় দরজা সরিয়ে একজন ভেতরে প্রবেশ করলেন। বছর চল্লিশের নীচেই হবে বয়স। স্মার্ট। থ্রিপিসে মানিয়েছেও চমৎকার। অ্যাটাচিকেশ আর চাদর জড়ানো বালিশ হাতে।

বললেন হাসি মুখে, মিঃ ব্যানার্জী নিশ্চয়? আমি ওম শারিন।

—চার্ট থেকে নিশ্চয় আমার নামের সন্ধান পেলেন। দিল্লী যাচ্ছেন নাকি, না আরো দূরে?

—দিল্লী পর্যন্ত। মাসে বার পাঁচেক যাওয়া আসা করতেই হয়। আপনি—?

—কলকাতা যাব।

—বার্থের জন্যে ওয়ার করে দিয়েছেন তো?

—ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসে বার্থ বুক হয়েছে।

শারিন দ্রুত হাতে আপার বার্থে চাদর পেতে ফেললেন। অ্যাটাচিটা রাখলেন বালিশের পাশে। বাসবের পাশে বসতে বসতে বললেন, গত সেপ্টেম্বরে কলকাতা গিয়েছিলাম। ওখানকার ভবানীপুর অঞ্চলে আমার এক বন্ধু থাকেন।

—তাই নাকি! এবার গেলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। মধ্য-কলকাতাতেই থাকি। ঠিকানা দিয়ে দেব।

—নিশ্চয় দেখা করবো।

দুলে উঠল ফ্রন্টিয়ারমেল। বার দুই তীক্ষ্ন চিৎকার করে দীর্ঘ যাত্রা আরম্ভ করল। সম্ভবতঃ এটিই ভারতের দূর পাল্লার ট্রেনগুলির মধ্যে সব চেয়ে বেশী পথ অতিক্রম করে। পাঠানকোট থেকে দিল্লী

হয়ে বসে। দরজায় করাঘাত হল এই সময়। ভেতরের অবস্থান-কারীদের সতর্ক করে দেবার পর যিনি প্রবেশ করলেন, তাঁকে দেখে বাসব অবাক হয়ে গেল। ভাটিয়া সাহেব—আপনি!

ভাটিয়া সাহেব মৃদু হাসলেন। ভারী চেহারার মানুষ। বয়স পঁয়তাল্লিশের কম হবেনা। রং অত্যন্ত ফরসা হওয়ার দরুনই বোধহয় চুলের রং ও ঈষৎ বাদামী। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উঁচু দরের কর্মচারী। বাসব যে তদন্ত নিয়ে পাঠানকোটে এসেছিল, ইনি সেই ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন।

—দুপুরে যখন দেখা হল, বললেন নাতো আপনিও যাচ্ছেন?

হাসি বজায় রেখেই ভাটিয়া সাহেব বললেন, ইচ্ছে করেই বলিনি। উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে অবাক করে দেব। মনে হয় আমি সফল হয়েছি।

বাসব হেসে ফেলল।

কাল বোধহয় কলকাতা রওনা হতে পারবেন না।

—কেন?

—জানেনতো সরকার কাজটা ঠিক মত করিয়ে নেয়। কিন্তু পেমেণ্ট এত বেড়া টপকাতে টপকাতে আসে যে সময়ে হাতে পৌছায় না। আমার বিশ্বাস আপনার চেক কাল রেডি হয়ে উঠবে না।

—না হোক—বাসব বলল, পরে আপনারা পাঠিয়ে দেবেন।

শারিন দরজার দিকে এগুলেন। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, দেখি পরিচিত কেউ আছে কিনা। কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

—আপনি একাই চলেছেন, না মিসেস সঙ্গে আছেন?

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ভাটিয়া সাহেব বললেন, আমার মিসেস হপ্তাখানেক এখন পাঠানকোটেই থাকবেন। আপনাকে বলা হয়নি, বালবীর খান্নাও চলেছেন। ওঁর স্ত্রী রয়েছেন সঙ্গে। আমরা একটা ফোরবার্থ কম্পার্টমেণ্টে রয়েছি।

বালবীর খান্না দিল্লীর একটি অতি চালু কফি হাউসের মালিক।

বয়স পঞ্চাশের নীচেই। সরকারী মহলে বিশেষ খাতির আছে তাঁর। কি কারণে যেন পাঠানকোট গিয়েছিলেন। ভাটিয়া সাহেবই আলাপ করিয়ে দেন বাসবের সঙ্গে। পরিচিত মহলে খান্না সকলের চোখেই ঈর্ষার পাত্র। সম্প্রতি এই বয়সে যে স্ত্রী রত্নটি লাভ করেছেন তাতে আরো সকলের ঈর্ষা কাতর হয়ে উঠেছে। প্রেমা খান্নার বয়স পঁচিশ এবং স্বরূপা—এটাই শেষ কথা নয়, তার হাস্য লাস্য যে কোন পুরুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে সদাই প্রস্তুত।

সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকবার টান দেবার পর ভাটিয়া সাহেব আবার বললেন, আজকে যাত্রা করে ভালই হয়েছে। বগিতে উঠেই এমন একজনকে দেখেছি যার নামে ওয়ারেণ্ট ঝুলছে। আজ বছর দেড়েক ধরে লোকটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

—কোন দাগী আসামী।

—গোল্ড স্মাগলার। চেতন কাপুর—পেপারে ওকে নিয়ে খুব হৈ হৈ হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাত ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে। চার্ট পরীক্ষা করে দেখলাম। এখন চলেছে অন্য নামে।

—সে আছে কোথায়?

—আপনার পাশের কুপেতে।

বাসব পাইপে মিক্সচার ঠাসতে ঠাসতে বলল, আপনি নিশ্চিত, ওই লোকটা সেই কুখ্যাত গোল্ড স্মাগলার।

—পঁচাত্তর পারসেণ্ট নিশ্চিত। মুখে এখন চাপ দাড়ি, তাই একটু গোলমাল হচ্ছে।

—পাশেরটা তো 'এফ' নাম্বার কুপে। ও একাই যাচ্ছে, সঙ্গে আর কেউ আছে?

—চার্টে তো দেখলাম। প্রকাশ মেহতা নামে আরেকজন রয়েছে কুপেতে।

—চেতন কাপুর কি নামে চলেছে?

—দেব গিলানী। এখন কিছু বলছিনা। দিল্লীতে পৌছেই ওকে

আটকাতে হবে। সত্যি সত্যি ও যদি চেতন কাপুর হয় তবে তো সোনায় সোহাগা। একটা পেণ্ডিং কেস সলভ হয়ে গেল।

—ওই সঙ্গে উঁচু মহলে আপনার খাতিরটাও বাড়লো, কি বলেন?

ভাটিয়া সাহেব কিছু বললেন না। হাসলেন শুধু।

ওদিকে—প্রেমা খান্না নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে চলেছেন। গন্তব্যস্থল বাথরুম। মানুষের ঘুম কেড়ে নেবার মত চেহারা সত্যি। মেরুন রং'এর শালোয়ার পাঞ্জাবীতে আরো মনোরমা হয়ে উঠেছে। আরো কয়েক পা এগিয়ে যাবার পরই দেখলো একজন বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে,তাকে দেখেই প্রেমার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

চেতন কাপুর! চেতন প্রথমে সচকিত হয়েছিল; তারপরই তার মুখে হাসি দেখা দিল। ট্রাউজারের পকেট থেকে রুমাল বার করে নিজের মুখ মুছে নিল ভাল করে। তারপর লঘু পায়ে প্রেমার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল মৃদু গলায়, ভাগ্যটা সত্যি আমার সুপ্রসন্ন। গতকাল ভেবেছিলাম, ফ্রন্টিয়ারমেলে যাব না। বাই কার দিল্লী চলে যাই। ভাগ্যিস প্রোগ্রাম বদল করিনি। অনেকদিন পরে দেখা হল, কি বল জানেমান?

প্রেমা কাঁপা গলায় বলল, ও সমস্ত কথা বলবেন না। আমার পথ ছাড়ুন।

—আপনি—! চেতন অবাক হয়ে যায়।

—দু'বছরে অনেক পাল্টে গেছো দেখছি? তুমি থেকে একেবারে আপনি। আমাকে একেবারেই ঝেড়ে ফেলে দিয়েছো?

—এখন আমি একজন বিবাহিতা মহিলা। আপনি সরে দাঁড়ান। অন্য কেউ এখানে এসে পড়তে পারে।

—কোন ক্ষতি নেই। তারা দেখবে একজন ভদ্রলোক একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছেন। তবে বুড়ো ভাম এসে পড়লেই

ঝামেলা। ওই লোকটাকে তুমি বিয়ে করলে কি বলে?'

প্রেমা নিজেকে শক্ত করবার চেষ্টা করল।—অনেক বাজে কথা বলেছেন, আর নয়। এবার আমায় যেতে হবে।

ও ফিরে দাঁড়াল। নিজের কামরার দিকে পা বাড়াবার আগেই চেতন ওর একটা হাত চেপে ধরে বলল, পিছলে বেরিয়ে গিয়েছিলে। অনেক খুঁজেও তোমাকে পাইনি। তারপর শুনলাম ওই ওল্ড হ্যাগার্ড তোমায় বিছানায় নিয়ে গিয়ে তুলেছে। এতদিন পরে দৈবাৎ যখন দেখা হয়ে গেল তখন সহজে তোমাকে ছাড়ছিনা জানেমান। সামনের কামরাটা খালি আছে। এস, ওখানে যাওয়া যাক।

ঝটকা দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রেমা বলল, যেদিন জানতে পারলাম আপনি একজন গোল্ড স্মাগলার,সেদিনই আমি সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না। পিছনের কথা আমি সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চাই।

—চাও নাকি! নাটক জমিয়ে তুললে দেখছি। এখন তুমি বুড়োটার কাছে ফিরে যেতে পার। তবে কান খুলে শুনে রাখো, এবার থেকে আমি তোমার বাড়িতে যাওয়া আসা করবো। আমার পরিচয় হবে পিশতুতো ভাই।

—না। আপনি আসবেন না।

—নিশ্চয় আসবো। আমার পাখি অন্য ডালে বসে কোন সুরে ডাকছে কাছ থেকে গিয়ে শুনতে হবে বইকি।

—আমি বলছি আপনি আসবেন না। নইলে—

চেতন হাসল। পুলিশে খবর দেবে? ও কাজ করতে যেওনা। ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনবে। মনে আছে তো হৃদয় নিভৃতে খান-কয়েক চিঠি আমাকে লিখেছিলে। আমি কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় ওগুলো পাঠিয়ে দেব বুড়ো ভামের কাছে।

—প্লীজ। ও কাজ আপনি করবেন না।

—না করে উপায় কি? এছাড়া পুলিশকে আমি জানিয়ে দেব

স্মাগলিং-এর ব্যাপারে তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছো।

প্রেমা কি বলতে গিয়েও বলল না। থম থমে মুখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ফিরে চলল নিজের কুপের দিকে।

বালবীর খান্না তখন লোয়ার বার্থে কাৎ হয়ে শুয়ে রগরগে একটা পকেট বই পড়ছেন। এই ধরনের পকেট বইগুলো তাঁর অত্যন্ত ভাল লাগে। স্থির করে রেখেছেন, হাতে সময় এলেই এই ধরনের কিছু লেখা তিনিও লিখবেন। প্রেমা এই সময় প্রবেশ করল। বই মুড়ে, চোখ কুঁচকে স্ত্রীর দিকে তাকালেন খান্না। বললেন, আমি তো ভাবলাম ফিরে এলে না বুঝি।

—বাথরুমে গিয়েছিলাম।

—মিথ্যে কথা আমি পছন্দ করিনা জানতো। লোকটা কে?

প্রেমা হীম হয়ে এল। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, দরজা ফাঁক করে বালবীর ওদের কথা বলতে দেখেছে। যার মনের আনাচে কানাচে নানা সন্দেহ বাসা বেঁধে রয়েছে আগে থেকেই, এবার সে কি করে বসবে কে জানে।

যতদূর সম্ভব নিজেকে সহজ করে নিয়ে বলল, সকালে আলাপ করিয়ে দেব। সম্পর্কে আমার পিশতুতো ভাই হন

—তোমার পিশতুতো ভাই আছে জানতাম নাতো! তা ভাইটি এখন দিল্লীতেই থাকবেন বোধহয়? আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন যাওয়া আসা করবেন নাকি?

দূর সম্পর্কের ভাইদের আবার আমি পছন্দ করিনা। ভদ্রলোককে কথাটা জানিয়ে দিও। এবার দয়া করে আপার বার্থে উঠে পড়। রাত বাড়ছে।

মেহনত করেই আপার বার্থে উঠতে হল প্রেমাকে। বালবীর খান্না আবার পকেট বই-এ মন দিলেন।

বাসবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রচণ্ড করাঘাত হচ্ছে দরজার উপর।

ব্যাপার কি? চকিতে বাসব রেডিয়াম ডায়েল যুক্ত সিমাষ্টারের দিকে তাকাল—একটা চল্লিশ। ওম শারিনেরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি আপার বার্থ থেকে নীচে নামলেন। বাসব ততক্ষণে আলো জ্বেলে ফেলেছে। দরজা খুলতেই মহা উত্তেজিত ভাটিয়া সাহেবকে দেখা গেল।

—কি হয়েছে?

—একটা খুন হয়ে গেছে মিঃ ব্যানার্জী।

—খুন! বলেন কি? চলন্ত গাড়ীতে খুন হয়ে গেল?

—তাই হয়েছে। চেতন কাপুর ছোরা খেয়ে পড়ে রয়েছে। আর তার সহযাত্রীর টিকি দেখা যাচ্ছে না।

বিস্মিত গলায় বাসব বলল, চেতন কাপুর—স্মাগলার বলে যাকে আপনি সন্দেহ করছিলেন। নাম ভাঁড়িয়ে যে আমার পাশের কুপেতে ছিল।

—ঠিক তাই। আপনি একবার দয়া করে আসবেন। পুলিশকে তো হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাথমিক তদন্তটা যদি—

—বেশ তো। চলুন।

বাসব দ্রুত এগুলো। ওকে অনুসরণ করলেন ভাটিয়া সাহেব আর ওম শারিন। পাশের কুপের সামনে অন্যান্য যাত্রীরা ভীড় করে রয়েছেন। কনডাক্টর গার্ড অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। এখন তার কি করা উচিত স্থির করতে পারছে না। বাসব পাল্লা সরিয়ে ভেতরে গেল। ভাটিয়া সাহেব আর শারিন দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার সামনে।

চেতন কাপুরের দেহের পুরোটা বার্থের উপর নেই। নিম্নাঙ্গ ঝুলছে। পরনে শ্লিপিং স্যুট। তলপেটের কিছুটা উপরে লাল হয়ে রয়েছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত তখনও একটু থেমে থেমে মেঝেয় পড়ে চলেছে। অর্থাৎ এই হত্যাকাণ্ড খুব বেশীক্ষণ আগেকার ঘটনা নয়। ভারী মুঠো যুক্ত ছোরাটা আমূল বসান রয়েছে আরো এক বিঘত

উপরে। অর্থাৎ বুকের প্রায় মাঝামাঝি। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, হত্যাকারী কোন রকম চান্স নেবার চেষ্টা করেনি। প্রথমে তলপেটের উপরে স্ট্যাব করেছে। তারপর ছোরাটা তুলে নিয়ে আবার মেরেছে বুকের উপর। কোন আঘাত মৃত্যু নিয়ে এসেছে পোষ্টমর্টম করার আগে বলা কঠিন। চতুর্দিকের সুবিন্যস্ত অবস্থা দেখে বোঝা যায় হত্যাকারীর সঙ্গে ভিক্‌টিমের কোনরকম ঝটাপটি হয়নি। হয়তো সে নিদ্রিত অবস্থায় এই মানুষটিকে খুন করেছে কিংবা কথা বলতে বলতে কোন অসতর্ক মুহূর্তে আঘাতটা করে বসেছে। বডি এই অবস্থায় পড়ে থাকার কারণ, হত্যাকারী ইচ্ছাকৃত ভাবে পরিবেশ এই ভাবে সাজিয়েছে।

বার্থের তলা থেকে সুটকেশের একটা কোণ বেরিয়ে এসেছিল। বাসব ঝুঁকে সুটকেশটা টেনে বার করল। আশ্চর্যের বিষয় তালা খোলা এবং তালার সঙ্গে চাবি লাগান। চব্বিশ ইঞ্চির দামী সুটকেশ। ডালা তুলে ধরল বাসব। জামাকাপড় তালগোল পাকিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ দ্রুত হাতে ঘাঁটা-ঘাঁটি করা হয়েছে।

বাসব একে একে সমস্ত কিছু বার করে মাটিতে রাখতে লাগলো। শেষেহাতে এল একটা সোনার বাঁট! আন্দাজ চার ইঞ্চি লম্বা, আড়াই ইঞ্চি চওড়া—দু ইঞ্চি পুরু বাঁটটা ওজনে পনেরো ভরির কম হবে না। বাসব এতক্ষণে খুনের মোটিভ আন্দাজ করতে পারলো। এই সুটকেশে আরো বহু এই ধরনের বাঁট আছে একথা জানা ছিল হত্যাকারীর। সে চেতন কাপুরকে খুন করার পর বাঁটগুলো নিয়ে সরে পড়েছে। ব্যস্ততার দরুণ এই বাঁটটা যে রয়ে গেছে লক্ষ্য করেনি।

বাসব সোনার বাঁটটা পকেটস্থ করে, সুটকেশ আবার বার্থের তলায় ঠেলে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল যেখানে ওভারকোট ঝোলান রয়েছে। পকেটগুলো হাতড়ে কাজে লাগে এমন কিছু পাওয়া গেল না। সিগারেট, দেশলাই, পানের মশলার কৌটা ইত্যাদি

ধরনের টুকিটাকি রয়েছে। ওভারকোটের তলায়, একই হুকে ঝুলছিল টেরিউলের সিঙ্গিল ব্রেষ্ট একটা কোট। বাসব এবার এই কোট পরীক্ষায় মনযোগী হল।

দুই পাশ পকেটে কিছু নেই। ডান পাশের ভেতরের পকেট থেকে পাওয়া গেল খামে মোড়া দুখানা চিঠি আর বেগুনে রং-এর প্লাষ্টিকের জ্যাকেট দেওয়া নোট বই। নোট বই এর পাতা ওল্টাতে লাগল বাসব। খাপছাড়া ভাবে হিসাব লেখা রয়েছে। হিসাব পরীক্ষা করে কিছু বুঝতে পারা গেল না। বাসব খাম থেকে এবার একটা চিঠি বার করল। ইংরাজীতে টাইপ করা চিঠিখানা নিম্নরূপ—

প্রিয় কাপুর—

পার্টি রেডি আছে। তুমি বুধবার দিল্লী নিশ্চিত ভাবে চলে এস। লোকটা গুজরাটি। ফিরে যাবার জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি তাকে আটকাতে পারি। মাল পঁচাত্তরের কম হলে চলবে না। সে মত ব্যবস্থা করবে। আরও কিছু জরুরী কথা আছে! দেখা হবার পর বলবো।—দিওয়ান

ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে—বাসব চিন্তা করে দেখল, দিওয়ান নামে স্মাগলিং জগতের কোন বিশিষ্ট লোক এক গুজরাটি পার্টির জন্যে পঁচাত্তর হাজার টাকার সোনার বাঁট দিল্লী নিয়ে যেতে বলেছে। সেই অর্ডার নিয়ে যাবার পথেই খুন হয়ে গেছে চেতন কাপুর। মালও উধাও হয়েছে। বাসব এবার দ্বিতীয় চিঠিখানা বার করল।

প্রিয় কাপুর,

মাল সংগ্রহ করতে খুব বেশী ঝামেলা হয়নি জেনে খুশী হলাম। অত্যন্ত সাবধানে আসবে। অবশ্য পত্র বাহক ট্রেনেই থাকছে। মাঝে মাঝে সে তোমার কামরায় গিয়ে দেখা করবে। কোন অসুবিধা দেখা দিলেই ওর সাহায্য নিতে ভুলবে না।—দিওয়ান।

অনেক আগে থেকে ঠাণ্ডা অনুভব করলেও বাসব সেদিকে মন দেয়নি। জোরাল কোন সূত্র আবিষ্কার করা যায় কিনা ওর দৃষ্টি ছিল

সেইদিকে। দ্বিতীয় চিঠি পড়া শেষ করে মুখ তুলতেই সে বুঝতে পারল, এয়ারকণ্ডিশন কুপের মধ্যে শীত করতে থাকার কারণটা কি? একটা জানলার পর্দা সামান্য সরানো। ফাঁক দিয়ে হাওয়া আসছে। এ রকম তো হবার কথা নয়। অন্যান্য বগির মত এয়ারকণ্ডিশন বগির জানলাতে সার্টার লাগানো থাকে না। বড় আকারের কাঁচ সর্বক্ষণের জন্য ফ্রেমের মধ্যে আটকানো। যাত্রীরা আলো অপছন্দ করলে ভারী পর্দা কাঁচের উপর টেনে দিতে পারেন। হাওয়া ঢোকার তো কোন পথ নেই। তবে—? বাসব পর্দা সরাতেই লক্ষ্য করল, কাঁচ খানিকটা ভাঙ্গা। হাওয়া ওই পথ দিয়েই আসছে। ভাঙ্গা অংশের বিস্তার অবশ্য বিরাট নয়, হাতের মুঠো কোনরকমে গলতে পারে। এই সঙ্গে বুঝতে পারা যায় ভারী কিছু দিয়ে ঠুকে ভাঙ্গা হয়েছে।

বাসব মিনিট কয়েক কি সমস্ত চিন্তা করল, তারপর বেরিয়ে এল কুপ থেকে। বাইরে উৎকণ্ঠিত মুখে সকলে দাঁড়িয়ে। প্রেমা আর বালবীর খান্নাও এসে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশী বিচলিত দেখাচ্ছে কণ্ডাক্টর গার্ডকে।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন ভাটিয়া সাহেব, কিছু বুঝতে পারলেন, মিঃ ব্যানার্জী ?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, একেবারে কিছু বুঝিনি বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। তবে আরো অনেক কিছু এখনও বুঝতে হবে। পরের স্টেশন আসতে আর কত দেরী ?

কণ্ডাক্টর গাড´ নিজের রিষ্টওয়াচ দেখে নিয়ে বলল, পঁয়ত্রিশ মিনিটের মত।

—পুলিশকে খবর দেওয়া ওখানেই যাবে। আপনারা ইতিমধ্যে এই কুপের মধ্যে কেউ যাবেন না। আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করবো মিঃ—

—মিষ্টার পুরী। কিন্তু—কণ্ডাক্টর বলল, আপনার পরিচয়টা এখনও পাইনি। আপনি কি—?

উত্তরটা দিলেন ভাটিয়া সাহেব।—আপনি ও সমস্ত নিয়ে চিন্তিত হবেন না। পুলিশ এলে যা বলবার আমিই বলবো। মিঃ ব্যানার্জী, আপনি কি আমাদের কোন প্রশ্ন করতে চান?

—বাসব বলল, মিঃ পুরীকে আগে গোটা কয়েক প্রশ্ন করি। এই কুপেতে দুজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন তো?

—হ্যাঁ। একজন যে কোথায় সরে পড়লেন বোঝা যাচ্ছে না।

—এতে বোঝাবুঝির কি আছে মিষ্টার—বালবীর খান্না বললেন, লোকটা খুন করে কোন স্টেশনে নেমে গেছে। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, এত সব কাণ্ড আপনার নজরে কি ভাবে পড়বে বলুন?

পুরী দ্রুত গলায় বললেন, আমি ঘুমলেও, কারুর পক্ষে আমার অজান্তে বগি থেকে নেমে যাওয়া সম্ভব নয়।

—কেন?

পুরী বলার আগেই বাসব বলল, ভেতর থেকে দরজাগুলো লক করা। চাবি আপনার পকেটে এই তো? এবার বলুন, যিনি খুন হলেন তাঁর সহযাত্রীকে দেখতে কেমন ছিল?

—আমি তাঁকে দেখিনি।

—তাঁর টিকিট চেক করেন নি।

—মৃত ভদ্রলোকই এই কুপের দুটো রিজার্ভেশন চেক করিয়ে নিয়েছিলেন।

—বুঝলাম। সেই যাত্রীটিকে বোধহয় কেউই দেখেনি। যাহোক ট্রেন এমন কোন জায়গা পার হয়ে এসেছে কি, যেখানে প্রচুর শব্দ-টব্দ হয়?

অবাক হয়ে পুরী বলল, আমি আপনার কথাটা ঠিক—

—ধরতে পাচ্ছেন না? কোন টানেল বা ব্রীজ-ট্রিজ আছে পথে?

—বড় একটা ব্রীজ পার হতে হয়।

—রাত কটায় ট্রেন ওখানে পৌছায়?

—দেড়টা আন্দাজ।

—মৃতদেহ আবিষ্কার করল কে ? আপনি ?

—হ্যাঁ। তিনটে বাজার কিছু আগে করিডর দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই কুপের দরজা সরানো ছিল। তাতেই—

—বুঝলাম। আর কোন প্রশ্ন নেই। বাসব এবার আর সকলকে উল্লেখ করে বলল, আপনারা কেউ কিছু বলতে পারেন। তুচ্ছ হলেও হয়তো কাজে লাগবে।

কেউ কিছু বলতে পারলেন না। সকলেই যে যার ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন জানালেন।

হঠাৎ বালবীর খান্না স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, তুমি কিছু জান নাকি ?

প্রেমা বিলক্ষণ বিরক্ত হল।—আমি—?

—হ্যাঁ। তোমার কথাই বলছি। এরকম দেখা গেছে ছেলেদের চোখ এড়িয়ে গেলেও মেয়েদের চোখে কিছু এড়ায় না।

—তুমি কি সমস্ত বলছো ! আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম।

বাসব সিমাষ্টারের দিকে তাকিয়ে নিয়ে নিজের কুপেতে গিয়ে ঢুকলো। যাত্রীদের মধ্যে কয়েক মিনিট ধরে কিছু অর্থহীন কথাবার্তা হবার পর যে যার কামরার দিকে পা বাড়ালেন। কণ্ডাক্টর অবশ্য দাঁড়িয়ে রইল 'এফ' নম্বর কুপের সামনে।

ভাটিয়া সাহেব আর ওম শারিন 'ই' নম্বর কুপের ভেতরে গিয়ে দেখলেন, বাসব ধোঁয়ার জাল বুনে চলেছে। তাকে যে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে তা নয়। বলল, পরের স্টেশনের নাম কি ?

ভাটিয়া সাহেব বললেন, জানি না। আপনি জানেন ?

শারিন বললেন, এপথে আমার যাওয়া আসা নেই। মনে হয় আর মিনিট দশেকের মধ্যেই পরের স্টেশন এসে পড়বে।

—মিঃ ব্যানার্জী, কেসটার সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পারলেন ?

—বাসব মৃদু হাসল।—ব্যাপারটা তেমন জটিল নয়। আপনারাও মাথা খাটালে ধরে ফেলতে পারতেন। তবে অভিজ্ঞতার একটা দাম

আছে স্বীকার করবেন তো ? নানা ধরনের কেস ঘাঁটতে ঘাঁটতে থার্ড সেন্স আমার খুব সজাগ হয়ে উঠেছে ! তারই জোরে এখন অল্প আয়াসেই অনেক কিছু ধরে ফেলতে পারি।

—কি রকম ?

—খুলে বলুন দয়া করে। ভাটিয়া সাহেব আর শারিন—অসম্ভব আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

বাসব আবার হাসল।—বেশ। খুলেই বলছি। প্রথমেই বলে রাখি মৃত লোকটি যে গোল্ড স্মাগলার চেতন কাপুর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এবার মূল ঘটনায় আসুন, কাপুরের সহযোগীকে কেউ দেখেনি। কাপুরই দুটো রিজার্ভেশন চেক করিয়ে নিয়েছিল। কণ্ডাক্টরের মুখে আপনারা শুনলেন, কারুর পক্ষে তার অগোচরে এই বগি থেকে নেমে যাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে ?

শারিন উত্তেজিত গলায় বললেন, কাপুরের কোন সহযাত্রী ছিল না বলছেন ?

—ঠিক তাই। সে ফলস নামে একটা বার্থ বুক করেছিল। আসলে কুপেতে সে একাই ছিল।

ভাটিয়া সাহেব বলে উঠলেন, কিন্তু এত ভাড়া দিয়ে আরেকটা বার্থ বুক করতে গেল কেন ?

—সে চায়নি ওই কুপেতে আর কোন যাত্রী আসুক। তাই তাকে বাড়তি খরচ করে কুপের আপার বার্থটা রিজার্ভ করতে হয়েছিল। প্রশ্ন উঠবে কেন সে এ কাজ করলো ? উত্তরটা সহজ। নিজের নিরাপত্তার জন্য এ রকমটা তাকে করতে হয়েছিল। কারণ কাপুরের সঙ্গে ছিল পঁচাত্তর হাজার টাকার সোনার বাঁট। আপনারা চমকে উঠবেন না। আমি যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। দিওয়ান নামে কোন লোকের সহযোগীতায় সে ওই সোনা একজনকে বিক্রী করতে দিল্লী যাচ্ছিল। দিওয়ানের দুখানা চিঠি বর্তমানে আমার

পকেটে রয়েছে। তার একখানা থেকে একথাও জানা যায়, প্রয়োজন হলে কাপুরকে সাহায্য করতে পারে এমন একজন লোক আমাদের সঙ্গেই চলেছে। আপনারা নিশ্চয় এবার বুঝতে পেরেছেন, যেই রক্ষক সেই ভক্ষক হিসাবে দেখা দিয়েছে। এমনও হতে পারে পরিকল্পনাটা দিওয়ানের। পঁচাত্তর হাজার টাকার সোনা হাতাবার জন্য সে নিজের লোকের সাহায্যে কাপুরকে খুন করিয়েছে। বাসব থামল।

ভাটিয়া আর শারিনের মুখে কথা নেই।

বাসব আবার আরম্ভ করল, এবার আমাদের দেখতে হবে খুনটা হল কি ভাবে। হত্যাকারী যে চুপিচুপি কাপুরের ঘরে ঢুকে ছিল তা নয়। কারণ রাত তখন গভীর। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকাই স্বাভাবিক। কাপুর করাঘাত শুনে এমন কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবে যে তার বিশেষ পরিচিত। বলাবাহুল্য, সেই ব্যক্তিটি হল যে তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সে। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে আমি কণ্ডাক্টরকে প্রশ্ন করেছিলাম, ট্রেন এমন কোন জায়গা দিয়ে পাশ করেছে কিনা, যেখানে শব্দ-টব্দ হয়েছে।

দুজনেই ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ মনে আছে।

—প্রশ্নের উত্তরে কণ্ডাক্টর বলেছিল, দীর্ঘ ব্রীজ পার হতে হয়েছে মেল ট্রেনকে। ব্রীজের উপর দিয়ে কি দারুন শব্দ করতে করতে ট্রেন এগোয় আপনারা জানেন। হত্যাকারীরও জানা ছিল। তাই ওই সময়টাই সে খুন করার উপযুক্ত সময় বলে স্থির করেছিল। কারণ আঘাত পেয়ে কাপুর চেঁচিয়ে উঠলেও কেউ শুনতে পাবে না। মনে হয় কথা বলতে বলতেই ছোরাটা তৎপরতার সঙ্গে কাপুরের তলপেটে ঢুকিয়ে দেয় হত্যাকারী। আচম্বিতে আক্রান্ত হয়ে কাপুর নিস্তেজ হয়ে পড়ে যেতেই বুকে দ্বিতীয়বার ছোরাটা আমূল বসিয়ে দিতেই আর কিছু করার থাকে না। তখনই হত্যাকারী লক্ষ্য করে তার জামায় রক্ত ছিটকে এসে লেগেছে। জামাটা খুলে ফেলার পর জানলার কাঁচ কিছু দিয়ে ভেঙ্গে জামাটাকে চালান করে দেয় বাইরে।

তারপর কাপুরের একটা জামা গলিয়ে নিয়ে—সুটকেশ থেকে সোনার বাঁটগুলো বার করে, সুবোধ বালকের মত নিজের বার্থে এসে শুয়ে পড়ে। একটা বাঁট তার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল, সেটা ভাগ্যক্রমে আমি পেয়েছি। এই যে—বাসব বাঁটটা পকেট থেকে বার করে তুলে ধরল। ঝকঝকিয়ে উঠল আলোয়।

শারিন বললেন, হত্যাকারী এখনও তাহলে এই বগিতেই আছে?

—হ্যাঁ।

ভাটিয়া সাহেব প্রশ্ন করলেন, সোনার বাঁটগুলো?

—ও গুলোও আছে এই বগিতে।

ফ্রন্টিয়ারমেলের গতি মন্থর হয়ে আসছে। সামনে কোন স্টেশন। ঘড়িতে এখন পৌনে চারটে।

বাসব নতুন করে পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, প্রথমে স্টেশন মাষ্টারকে জানাতে হবে। উনিই পুলিশে খবর দেবেন। মেলকে অনেকক্ষণ আটকে থাকতে হবে।

ভাটিয়া সাহেব বললেন, সবই শুনলাম। কিন্তু খুনটা কে করেছে তা তো বললেন না।

—বুঝতে পারেন নি?

—না।

—মিঃ শারিন, আপনি বুঝতে পেরেছেন?

—না, মিঃ ব্যানার্জী।

বাসব এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, শ্লিপিং পাজামাটা তো পরে রয়েছেন দেখছি। কিন্তু শ্লিপিং সার্টটা কোথায়?

—তার মানে?

—না বোঝার ভান করবেন না মিঃ শারিন। ঘুমুতে যাবার আগে পুরোদস্তুর শ্লিপিং সুটই ছিল আপনার গায়ে। পাজামাটা ঠিকই আছে, ডোরা কাটা সার্টের বদলে এখন পরে রয়েছেন—

চিৎকার করে উঠলেন ওমশারিন—আপনি বলতে চাইছেন আমি—

হ্যাঁ। আমি তাই বলতে চাইছি। ভাটিয়া সাহেব, ইনিই তিনি। কাজ গুছিয়ে এনেছিলেন ভাল ভাবেই—তবে যা হয় আর কি। ভুলচুক একটু আধটু রয়েই যায়। গায়ে যদি রক্ত না লাগতো, জামা পাল্টাবার দরকার পড়তো না। তাহলে আমিও এত তাড়াতাড়ি সমাধানের কূলে পৌঁছাতে পারতাম না।

ভাটিয়া সাহেব হতবাক হয়ে গেলেন। শারিন তখনও ফুঁসছেন।

বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, জামা অদল-বদল না কি সমস্ত যেন বলছেন, তাতেই কি প্রমাণ হয়ে যাবে, আমি খুন করেছি?

—কাপুরের কুপে ডাষ্ট করবার পর আপনার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে ডজন খানেক, আর কোন এক্সপ্লেনেশন আছে কি আপনার কাছে? এরপর আসুন সোনার বাঁটগুলোর কথায়? এই জায়গাটায় বেশ বুদ্ধি খাটিয়েছেন। কোথাও লুকোবার চেষ্টা না করে, চোখের সামনে ফেলে রেখেছেন—যাতে কারুর কোন সন্দেহই হবে না। আপনার সম্পর্কে মন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি কুপেতে ফিরে এসেছিলাম একাই। আপনার এটাচিকেসের ওয়েটই আমাকে বলে দিয়েছে ওর মধ্যেই আছে বাঁটগুলো।

শারিন কিছু বলতে গিয়েও থামলেন? তাঁর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। ফ্রন্টিয়ারমেলের গতি মন্থর হতে হতে থামার মুখে।

জুতো জোড়া দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তার। লক্ষ্য করুন খুব বেশীদিন কেনা হয়নি। এ থেকে আমরা কোনসূত্র পেয়েযেতে পারি।

মৃতদেহ পোষ্টমর্টমে পাঠিয়ে দেবার পর বাসব জুতো জোড়া ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, মাস খানেকের বেশী ব্যবহার হয়নি। সামান্য ক্ষয়ে গেলেও ভেতরের লেবেল এখনও পড়া যায়। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ইয়েন সিনের দোকান থেকে কেনা হয়েছিল। বাসব জানে ইয়েন সিন ওই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ জুতো বিক্রেতা। ধনীদেরই তার দোকানে যাতায়াত।

পথে আসতে আসতে লক্ষ্য করছিলাম চারদিকটা কেমন ভিজে। এধারে বৃষ্টি হয়েছিল নাকি?

বিস্মিত বিমান সেন বললেন, দিন তিনেক ধরে এধারে খুব বৃষ্টি হয়েছে।

অথচ দেখুন জুতোর তলায় কাদা নেই। এতে প্রমাণিত হচ্ছে মৃতব্যক্তি এ অঞ্চলের নয়। অন্য কোথাও থেকে তার মৃতদেহ বাক্সর মধ্যে ভরে হত্যাকারী এখানে এনেছিল। অবশ্যই তাকে মোটরের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

সামন্ত বললেন, আপনার অনুমানই বোধহয় ঠিক। এখানকার মত এখানকার কাজ বোধহয় আমাদের শেষ হয়েছে। এবার ফেরা যেতে পারে।

কলকাতায় পৌঁছেই সামন্ত জুতো জোড়া নিয়ে পড়লেন।

ইয়েন সিনের দোকানে প্রয়োজনীয় তথ্যই পাওয়া গেল। প্রতিদিন এখান থেকে অজস্র জুতো বিক্রী হচ্ছে। প্রত্যেক ক্রেতার নাম বা চেহারা মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ছিল। এই বিখ্যাত দোকানে অনেকে অর্ডার দিয়ে জুতো তৈরী করান। স্বাভাবিক কারণেই অর্ডার বুকে তাদের নাম ঠিকানা টুকে রাখতে হয়। এই জুতো জোড়াও অর্ডার দিয়ে করান হয়েছে মাত্র মাস খানেক আগে। কাজেই ক্রেতার সন্ধান পাওয়া গেল। নাম,

জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরী। ঠিকানা, আটত্রিশের বি রামনারায়ণ লেন। কলকাতা, নয়।

সামন্ত আর কালবিলম্ব না করে রামনারায়ণ লেনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বাড়ির চাকচিক্য দেখেই বুঝতে পারা যায় গৃহকর্তা সম্পদশালী ব্যক্তি। বেল বাজাতেই একজন এসে ঘর খুলে দিল। চাকর বলেই মনে হয় কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীকে দেখে সে আর কাল বিলম্ব না করে ওখান থেকে অদৃশ্য হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আরেকজনের দেখা পাওয়া গেল। বয়স বছর পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। সবলদেহী এই ব্যক্তির মুখে চিন্তার গভীর প্রলেপ।

আপনারা···

সামন্ত বললেন—জ্ঞানরঞ্জনবাবু আছেন?

না·· মানে···আপনারা ভেতরে আসুন।

সামন্ত দুই সঙ্গীকে নিয়ে যুবকের পিছু পিছু একটি সুসজ্জিত ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনজনকে বসতে অনুরোধ করে বিষন্ন গলায় সে আবার বলল, ৮ই জুন থেকে আমার বাবার কোন সংবাদ পাচ্ছিনা।

সে তো দিন পুরনো ব্যাপার, পুলিশে সংবাদ দেননি কেন?

উনি কাউকে কিছু না বলেই মাঝে মাঝে দেওঘর বা বেনারস চলে যেতেন। প্রথমে আমরা গা করিনি। ভেবেছিলাম যেমন যান তেমনি গেছেন। পরে খোঁজ খবর নিয়ে দেখি দেওঘর বা বেনারস যাননি। তখনই আমাদের চিন্তা বাড়তে থাকে। পুলিশে সংবাদ দেওয়ার কথাই ভাবছিলাম। এমন সময় আপনারা···

উনি কি কাজ করতেন?

আমাদের আয়রণ ফাউণ্ড্রী আছে। আপনারা বাবার সম্বন্ধে এত খোঁজ নিচ্ছেন···কি হয়েছে বলুন তো?

সামন্ত ভারী গলায় বললেন, আপনার বাবা বোধহয় আর বেঁচে

নেই। মর্গে লাস এখনও রাখা আছে। সনাক্তকরণের জন্য একবার যেতে হবে।

যুবক প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর ভেঙে পড়ল সেণ্টার টেবিলের উপর। কান্নায় তার শরীরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে শান্ত হয়ে ভেজা গলায় বলল, বাবা নেই, এ যে আমি ভাবতেও পারছি না!

সামন্ত তাকে অনেক সান্ত্বনার কথা বললেন। তারপর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আদায় করে নিলেন। জ্ঞানরঞ্জনের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে অনেকদিন আগেই। একমাত্র সন্তান চিত্তরঞ্জনকে নিয়েই তাঁর সংসার। আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল। তাঁর কোন শত্রু ছিল না একথাই জানে চিত্তরঞ্জন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুও কেউ ছিল না, ইত্যাদি।

এরপর চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে সামন্ত মর্গের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

বাসব সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে অপরাধ বিজ্ঞান-এর একটা বই পড়ছিল। কল্যাণপুরের কাছে পাওয়া মৃতদেহ সম্পর্কে ওর আর কিছু জানা নেই। দিন দুয়েকের মধ্যে সামন্ত আর যোগাযোগ করেননি। অদূরে বসে শৈবাল এক মনে পেসেন্স খেলে চলেছে।

টেলিফোন বেজে উঠল।

বাসব রিসিভার তুলে নিয়ে সাড়া দিতেই ওপাশ থেকে সামন্তর গলা ভেসে এল, আমাকে অথৈ জলে ফেলে আপনি পাড়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন! সেদিনের পর থেকে তো আপনার টিকিটির পর্যন্ত দেখা নেই।

কতদূর কি হল কেসটার?

কিছুই হয়নি। আন অফিসিয়ালি আমাকে সাহায্য করতে রাজী আছেন কি না বলুন?

এতো রাগের কথা হল। নিশ্চয়ই রাজী আছি। এবার ঝেড়ে কাশুনতো। সামন্ত জ্ঞানরঞ্জন সংক্রান্ত সমস্ত কথা বললেন। গলিত

মৃতদেহ হওয়া সত্বেও তাঁর ছেলে মৃতদেহ সনাক্ত করতে পেরেছে একথাও জানালেন।

আমি জ্ঞানবাবুর বাড়িটা একবার ঘুরে ফিরে দেখতে চাই।

বেশ তো, কবে যাবেন?

আজই, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। ওখানে যাতে আমার কোন অসুবিধা না হয় সে ব্যবস্থা করে রাখবেন। আরেকটা কাজ করতে হবে। যে বাক্সর মধ্যে বডিটা পাওয়া গেছে ওটা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন।

বেশ।

বাসব ফোন ছেড়ে দিল।

চল ডাক্তার রামনারায়ণ লেন থেকে ঘুরে আসি।

তোমার ঘাড়েই কেসটা চাপল মনে হচ্ছে।

পুলিশকে তো অখুশী করা যায় না। বুঝতে তো পারছই ওদের সহযোগিতাতেই আমার কারবার।

তা বটে।

আরও কিছুক্ষণ পরে দু'জনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

রামনারায়ণ লেনের নির্দিষ্ট বাড়িতে লক্ষ্য করা গেল, মিঃ সামন্ত সমস্ত ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। চিত্তরঞ্জন ম্রিয়মান মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে ওদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথাবার্তা বলে বাসব জ্ঞানরঞ্জনের শয়ন কক্ষটি দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

চিত্তরঞ্জন দুজনকে নিয়ে গেল ওখানে।

একজন ধনী ব্যক্তির শয়নকক্ষ যেমন হওয়া উচিৎ তার ব্যতিক্রম নয়। পরিপাটি করে চতুর্দিকে সাজানো। নিভাঁজ শয্যা খাঁ খাঁ করছে। প্রশ্ন করে জানা গেল, ঘরের আলমারীগুলিতে পুলিশ তল্লাসী চালিয়েছিল। সুতরাং ওদিকে হাত বাড়িয়ে লাভ নেই। যদি কোন সূত্র থাকে তবে তা এখন পুলিশের হাতে।

পাশের ঘরে কে থাকে?

ওটা স্টাডি। ও ঘরে বাবা পড়াশোনা করতেন।

বাসব পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। দেওয়াল বেড়ে কাঁচের বড় বড় পাল্লা দেওয়া আলমারী। ইংরাজী ও বাংলা বই ঠাসা। একধারে সুদৃশ্য সেক্রেটেরীয়েট টেবিল। টেবিলের থরে থরে ফাইল সাজানো। বলাবাহুল্য এ সমস্ত ব্যবসা সংক্রান্ত। আরও কিছু টুকিটাকি জিনিষ রয়েছে ওখানে।

বাসব বলল, পুলিশ এঘর থেকে কিছু নিয়ে গেছে নাকি?

দেরাজে বাবার ডায়েরী ছিল, ওটা নিয়ে গেছে।

দেরাজে চাবি লাগানো আছে নাকি?

না।

লম্বালম্বি ভাবে তিনটি দেরাজ আছে সেক্রেটেরীয়েট টেবিলে। প্রথমটা বাসব দেখল, চেক বুক, কিছু চিঠি-পত্র, একটা পকেট ঘড়ি ও ছোটখাট আরও অনেক কিছু রয়েছে। দ্বিতীয় তাকে পাওয়া গেল, গোছা খানেক এ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক। বিভিন্ন বছরের। চলতি বছরেরটা উপরেই ছিল। বাসব পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ৮ই জুনে এসে থামল—এই দিনই জ্ঞানরঞ্জন বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়েছিলেন। দেখা গেল ৮ই জুন তাঁর তিনজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। সেই তিন ব্যক্তি হলেন, মৃণাল দোস্তিদার, কিঙ্কর সরকার আর অমিয় সোম।

চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে জানা গেল, এই তিনজনই ফাউণ্ড্রীর প্রয়োজনে যে সমস্ত মাল লাগে তারই সাপ্লায়ার! ব্যবসার সূত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। বাসব ওদের ঠিকানা নোট করে নিল। এখানে আর কিছু করার ছিল না। চিত্তরঞ্জনকে এক প্রস্থ সান্ত্বনা দিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

তুমি এবার কোথায় যাবে?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, বিবেকানন্দ রোডে যাব।

মৃণাল দোস্তিদারের সঙ্গে আগে কথা বলব ভাবছি।

আমাকে তাহলে ছেড়ে দাও ভাই। আজ একটা মেজর অপারেশন আছে। শৈবাল চলে যাবার পর বাসব একটা ট্যাক্সির সহযোগিতায় বিবেকানন্দ রোডের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছাল। অফিসেই পাওয়া গেল দস্তিদারকে। স্থূলকায় মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। গম্ভীর প্রকৃতিরই মনে হল। উৎসুক নেত্রে আগন্তুকের দিকে তাকালেন। বাসব নিজের পরিচয় দিয়ে এই তদন্তের সহযোগিতা প্রার্থনা করল।

দোস্তিদার বললেন, অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার। জ্ঞানরঞ্জনবাবু অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্রপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি যে এইভাবে খুন হবেন কল্পনাও করতে পারিনি। আমার কাছ থেকে কি ধরণের সহযোগিতা চাইছেন বলুন ?

গোটাকয়েক প্রশ্ন করব। সঠিক উত্তর পেলে আমার উপকার হবে।

বলুন ?

৮ই জুন জ্ঞানরঞ্জনবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ?

এসেছিলেন।

কখন ?

তখন বেলা দশটা।

কি কথাবার্তা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে ?

ব্যবসা সংক্রান্ত কথাই হয়েছিল। আধঘণ্টার বেশী থাকেন নি।

তখন কি তিনি স্বাভাবিক ছিলেন ?

অস্বাভাবিকত্ব কিছু দেখিনি।

এখান থেকে কোথায় যাচ্ছেন, সে সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন ?

একটু চিন্তা করে দোস্তিদার বললেন, যতদূর মনে পড়েছ, কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, খিদিরপুরের দিকে যাবেন।

আরও দু'চার কথার পর বাসব ওখান থেকে উঠল। অনেক

আশা নিয়ে এখানে এসেছিল, কাজে লাগতে পারে এমন কিছু বলা সম্ভব না। পাইপ ধরিয়ে নিয়ে চিন্তিত মুখে ও মোড়ের দিকে পা চালাল। আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপারটা জটিল মনে হচ্ছে বটে, প্রকৃত পক্ষে তা বোধহয় নয়। বিরাট একটা ফাঁক কোথাও আছে। তার সন্ধান পেলেই সমস্ত জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিঙ্কর সরকার ও অমিয় সোমের সঙ্গেও ক্রমে সাক্ষাৎ হল বাসবের। দুজনেই ক্ষুদে ব্যবসাদার। একজনের অফিস গণেশ এভিনিউ-এ, আর একজনের ধর্মতলা স্ট্রীটে। কিঙ্কর সরকার বললেন, ৮ই জুন বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ জ্ঞানরঞ্জন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কথাটা ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। এখান থেকে বেরিয়ে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন বলতে পারেন না। কারণ তিনি সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি, ইত্যাদি।

অমিয় সোমও এই একই রকম কথা বললেন। তাঁর সঙ্গেও জ্ঞান-রঞ্জন বেলা সাড়ে দশটার সময় দেখা করতে এসেছিলেন। কথাবার্তা ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই হয়েছিল; তিনি এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন সোম বলতে পারেন না।

বাড়ি ফিরে বাসব ঘোরাল চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল। তিনজনে একই কথা বলছেন। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে জ্ঞানরঞ্জন বেলা সাড়ে দশটার সময় দেখা করেছিলেন! একজন লোকের পক্ষে একই সঙ্গে তিনজনের সঙ্গে তিন ঠিকানায় দেখা করা কি করে সম্ভব? সুতরাং তিনজনেই নিঃসন্দেহে মিথ্যা কথা বলেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?

এই মিথ্যা কথা বলার নেপথ্যে কি কোন গভীর রহস্য নিহিত আছে? হয়ত এমনও হতে পারে, তিনজনই জানতেন তদন্ত করতে তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই কেউ আসবে। তাই যা হোক একটা সময় তাঁরা বলেছেন। কাকতালিয় ভাবে একই সময় উল্লেখিত হয়ে গেছে।

আবার এমন হওয়াও অসম্ভব নয়, জ্ঞানরঞ্জন কোন অজানা কারণে

আলাদা আলাদা ভাবে তিনজনকে জানিয়েছিলেন, সাড়ে দশটার সময় দেখা করবেন। হয়ত শেষ পর্যন্ত কারুর সঙ্গে দেখা করেন নি বা তিনজনের মধ্যে কোন একজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এখন ভয় পেয়ে গিয়ে সকলেই ওই সময়টার কথা উল্লেখ করেছেন।

কারণ যাইহোক, এই তিন মহাশয়ের মধ্যে যে কেউ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত এ সন্দেহ সহজেই মনকে নাড়া দেয়। বাসব পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আরো কিছুক্ষণ এই সম্পর্কে চিন্তা করল। তারপর বাহাদুরকে ডেকে জেনে নিল লালবাজার থেকে কাঠের বাক্সটা পাঠান হয়েছে কিনা?

বাক্সটা ঘণ্টাখানেক আগেই সামন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন। খাওয়া দাওয়া সেরে বাসব ওটা নিয়ে পড়ল। লম্বায় ফুট আড়াই হবে, উঁচুতে দু ফুটের বেশী নয়, দেবদারু বা ঐ জাতীয় কোন কাঠের তৈরী। এই সাইজের একটা বাক্সে মৃতদেহ বেশ ঠেসেঠুসেই রাখতে হয়েছিল। বাক্সের গায়ে কালি দিয়ে কিছু লেখা ছিল। বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় খালি চোখে পড়া গেল না। ম্যাগনিফ্লাইং গ্লাস দিয়ে বাসব পাঠোদ্ধার করল শেষ পর্যন্ত। লেখা আছে 'নাগপুর টু ক্যালকাটা।' মেয়ার্স কোং এবং ৭ ৭ ৭ ৭।

অর্থাৎ মেয়ার্স কোম্পানী ওই তারিখে নাগপুর থেকে কলকাতায় কিছু মাল এই বাক্সে বন্ধ করে পাঠিয়েছিল। ট্রেনে নয়, ট্রান্সপোর্টে পাঠিয়েছিল তাও বুঝতে পারা যাচ্ছে। নাগপুর থেকে বাক্সটা এসেছে খুব বেশীদিন হয়নি—মাত্র মাসখানেক আগে এসেছে।

বাসব ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

চার পাঁচটা ট্রান্সপোর্ট অফিসে খোঁজ খবর নিতেই জানা গেল, মেয়ার্স কোম্পানীর মাল বহন করে রোড ষ্টার ট্রান্সপোর্ট। রোড ষ্টারের অফিস তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে। ওখানে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে, নিজের পরিচয় দিয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে বাসব জানতে পারল রোড ষ্টার নিজের প্রয়োজনে মেয়ার্স কোম্পানী থেকে কিছু মেশিনারী

আনিয়েছিল। সাত-সাত-সাতাত্তরেই মালটা ওখান থেকে ডেসপ্যাচ হয়।

সেই প্যাকিং বাক্সটা আপনারা কি করেছিলেন?

বিস্মিত ম্যানেজার বললেন, মাল খালাস করে নেবার পর বাক্সগুলো আমরা বিক্রী করেছি।

সাত-সাত তারিখে আসা ওই বাক্সটা কাকে বিক্রী করা হয়েছে বলতে পারেন?

খাতাপত্র ঘেঁটে তিনি বললেন, বেশ কিছু বাক্স আমাদের কাছে জমা হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত বিক্রী করা হয়েছে রমনী জোয়াদ্দারকে। ভবানী দত্ত লেনে তার আড়ত আছে।

বাসব ঠিকানাটা ভাল করে জেনে নিয়ে রোড ষ্টারের অফিস থেকে বেরিয়ে এল। ভবানী দত্ত লেন এখান থেকে বেশী দূর নয়।

সন্ধ্যার মুখেই দস্তিদার, সোম আর দত্ত বাসবের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। পুলিশের আহ্বানেই অবশ্য তাঁরা এখানে এসেছেন। বেলা তিনটের সময় বাসব ফোন করে সামন্তকে জানিয়েছিল, কেশটা হেরাহেরি হয়ে এসেছে বলেই মনে হচ্ছে। উনি যেন আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনজনকে লালবাজারে ডেকে পাঠান। ওদের কোন অজুহাতে কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখে—তারপর তার বাড়িতে সন্ধ্যার মুখে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তবে এখুনি যেন একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে তার কাছে পাঠানো হয়। বিশেষ এক জায়গায় তদন্তে যেতে হবে

সামন্ত অনুরোধ মতই কাজ করেছেন।

বাসব কিন্তু বাড়ি নেই। দস্তিদার, সোম আর দত্তর মুখ অসম্ভব গম্ভীর। এতক্ষণ আটকে রাখার জন্য তারা পুলিশের এই জুলুমের প্রতিবাদ যে করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সামন্ত অদূরে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছেন। আরো মিনিট কুড়ি পরে বাসব বাড়ি ফিরল। মুখে সলজ্জ হাসি।

বসতে বসতে বলল, আপনাদের অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য আমি মর্মাহত। আর সময় নষ্ট করব না। এবার কাজের কথায় আসছি। আপনারা শুনলে আনন্দিত হবেন, হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে! তার নাম করার আগে আমি কিছু আলোচনার মধ্যে যেতে চাই। প্রথমেই জানিয়ে রাখি হত্যার মোটিভ কি তা আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। অবশ্য হত্যাকারীকে হাতে পাবার পর মোটিভের সন্ধান পেতে পুলিশের অসুবিধা হবে না। এবার আমি যা বলতে চলেছি তা অনুমানের উপরই নির্ভরশীল। তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাস্তব থেকে তার দূরত্ব খুব বেশী নয়! জ্ঞানরঞ্জন কেন জানা যায় না ৮ই জুন আপনাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেলা সাড়ে দশটার সময় নির্দেশ করেছিলেন. একই লোকের পক্ষে একই সময় তিনজনের সঙ্গে তিন জায়গায় দেখা করা সম্ভব নয়। কাজেই তিনি একজনের সঙ্গেই দেখা করেছিলেন! বলা-বাহুল্য সেই ব্যক্তিই হত্যাকারী।

সোম বললেন, আপনি বলতে চাইছেন আমাদের মধ্যেই কেউ জ্ঞানবাবুকে খুন করেছে?

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আমাকে একথা স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। তারপর শুনুন, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারা যায়, এটা প্রি-প্ল্যান মার্ডার নয়। দুজনের মধ্যে কোন কারণে উত্তেজনা চরমে ওঠে বা সেই অজানা মোটিভ হঠাৎ মাথা চাড়া দেওয়ায় ওই রক্তাক্ত বিপর্যয় ঘটে যায়। স্বাভাবিক কারণেই হত্যাকারীকে ভীত ও বিব্রত বোধ চেপে ধরে। কারণ যা হবার হয়ে গেলেও, মৃতদেহ সরিয়ে ফেলতে না পারলে বিপদের শেষ থাকবে না। কাজেই হত্যাকারীকে তার অফিস ঘরে তালা দিয়ে রাখতে হল—ওই ঘরেই ঘটনাটা ঘটেছিল। কর্মচারীরা বিকেলে চলে যাবার পর সে একটা প্যাকিং বাক্স কিনে আনে। বাক্সে মৃতদেহ ভরে, অফিস ঘরের চারদিকে ছিটিয়ে থাকা রক্ত পরিষ্কার করে, জীপে বাক্সটা চাপিয়ে নিয়ে চলে যায়

ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে অনেক দূরে। তারপর কল্যাণপুরের বন বাদাড়ে ফেলে আসে মৃতদেহ। নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন আমি কার কথা বলতে চাইছি। জীপ গাড়িই এই কাজের সহায়ক। এমনই যোগাযোগ, হত্যাকারীর একটা পুরানো মডেলের জীপ আছে।

দত্ত বললেন, সেকি! তবে—

দস্তিদার বললেন, আপনি কি তাহলে…কিন্তু…

ভারী গলায় বাসব বলল, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই মিঃ দস্তিদার। আপনি ভালরকমই জানেন, আমি ঠিক রাস্তা ধরেই এগিয়েছি। মিঃ সামন্ত, আমার কাজ শেষ হয়েছে। আপনার আসামী সামনেই রয়েছেন। স্বচ্ছন্দে গ্রেপ্তার করতে পারেন।